KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কল-১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 8/3 Award Issue 9/2 9/4	Year of Publication : Aug 1985 Oct 1985 May 1986 Aug 1986 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

বিভাব

৩২

সম্পাদক / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিভাব

সংসদের প্রকাশনা সাহিত্যজগতে অনন্য

- **বঙ্কিম রচনাবলী :** দু'খণ্ডে প্রকাশিত। সমগ্র উপন্যাস প্রথম খণ্ডে [৩৫·০০] সমগ্র সাহিত্য দ্বিতীয় খণ্ডে [৪০·০০]
  সম্পাদনা—যোগেশচন্দ্র বাগল।
- **গিরিশ রচনাবলী :** পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত সমগ্র রচনা। প্রতি খণ্ড [২৫·০০]।
  সম্পাদনা : ডঃ রবীন্দ্রনাথ রায় এবং ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য।
- **দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী :** সমগ্র রচনা দু'খণ্ডে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড [৪০·০০]। দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ।
  সম্পাদনা : ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়।
- **মধুসূদন রচনাবলী :** এক খণ্ডে প্রকাশিত সমগ্র রচনা [৩৫·০০]
  সম্পাদনা : ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত।
- **দীনবন্ধু রচনাবলী :** এক খণ্ডে প্রকাশিত সমগ্র রচনা [২৫·০০]
  সম্পাদনা : ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত।
- **তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ :** তিন খণ্ডে যাবতীয় ছোট গল্প সংকলিত। প্রথম ও তৃতীয় খণ্ড [৪০·০০]
  এবং দ্বিতীয় খণ্ড [৫০·০০]
  সম্পাদনা : অধ্যক্ষ জগদীশ ভট্টাচার্য।
- **সাত্যেন্দ্র কাব্য গুচ্ছ :** এক খণ্ডে সমগ্র কাব্য সম্ভার। [১০০·০০]
  সম্পাদনা : ডঃ অলোক রায়।

—প্রতিটি রচনাবলীতে লেখকের জীবনী ও তাঁর সাহিত্যকীর্তি আলোচিত—

… বিশদ তালিকার জন্য যোগাযোগ করুন …

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯

ফোন—৩৫-৭৬৬৯

সূচীপত্র

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

গ্রীষ্ম ১৩৯৩

বিভাব

প্র ব ন্ধ

ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখের চরিতার্থতা ॥ নিত্যপ্রিয় ঘোষ ১

শি ল্প ভা ব না

কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নয়ন প্রসঙ্গ : সুন্দরবনে বিটশর্করার চাষ ॥ সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭ অনুবাদ—নির্মল বসাক

আ লো চ না

চাকুরীর একাল সেকাল ॥ লাডলীমোহন রায়চৌধুরী ৩২

ক বি তা গু চ্ছ

দিলীপ রায়ের কবিতা ॥ ইন্দ্র গুপ্ত ৪১
দিলীপ রায়ের পাঁচটি কবিতা ৪২
শামশের আনোয়ারের কবিতা ॥ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ৪৬
শামশের আনোয়ারের আটটি কবিতা ৪৭

আ লো চ না

বাংলা সাহিত্যের ল্যাবরেটরী ॥ পিনাকী ভাদুড়ী ৫৪
বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সূচনা ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ : বিশ্বপরিচয় ॥ বাসুদেব মাইতি ৬৩

ব্যক্তিগত রচনা

গুণানন্দর আশা ॥ গুণানন্দ ঠাকুর ৬৭

গল্প

পাতার আগুন ॥ বরুণ চৌধুরী ॥ ৭২

সম্পাদকীয় ৮৪

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার

দেবীপ্রসাদ মজুমদার প্রদীপ দাশগুপ্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর

৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস | কলকাতা-১৭

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ : শঙ্কর ঘোষ/অনুপ রায়

অলংকরণ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত এবং সত্যনারায়ণ প্রেস, ১, রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখের চরিতার্থতা

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

শেষের কবিতা উপন্যাস যখন চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হলো, তখন চিত্রনাট্যকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় স্মরণ করেছিলেন, শেষের কবিতার অর্থ নিয়ে তাঁর নিজেদের বন্ধুদের মধ্যে তর্কবিতর্ক। প্রত্যেকেই এর তত্ত্ব গড়ে তোলেন এবং কারো তত্ত্বের সঙ্গে অন্যের তত্ত্ব মেলে না। তখন তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন :

"আমার একটা দুর্ভাগ্য আছে। যেখানে আমার হাঁটু জল, লোকে সেখানে ডুব জল ধরে নেয়।"

চলচ্চিত্র সম্পর্কের রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিরও এইরকম গভীর ব্যাখ্যা রয়ে থাকে। ১৩২৯ সালের ২৬ নভেম্বর শিশিরকুমার ভাদুড়ির ভাই মুরারি ভাদুড়িকে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠি দিয়েছিলেন, যেটা রক্ষিত আছে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে :

"উপকরণের বিশেষত্ব অনুসারে কলারূপের বিশেষত্ব ঘটে। আমার বিশ্বাস ছায়াচিত্রকে অবলম্বন করে যে নূতন কলারূপের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা যায় এখনো তা দেখা দেয়নি। স্বাতন্ত্র্যে স্বাতন্ত্র্যের সাধনা, কলাতন্ত্রেও তাই। আপন সৃষ্ট জগতে আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রত্যেক কলাবিদের লক্ষ্য। নইলে তার আত্মমর্যাদা অভাবে আত্মপ্রকাশ ম্লান হয়। ছায়াচিত্র এখনো পর্যন্ত সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে, তার কারণ কোনো রূপকার আপন প্রতিভার বলে তাকে এই দাসত্বের থেকে উদ্ধার করতে পারে নি। করা

কঠিন, কারণ কাব্যে বা চিত্রে বা সঙ্গীতে উপকরণ দুর্মূল্য নয়। ছায়াচিত্রের আয়োজন আর্থিক মূলধনের অপেক্ষা রাখে, শুধু সৃষ্টিশক্তির নয়।

"ছায়াচিত্রের প্রধান জিনিসটা হচ্ছে দৃশ্যের গতিপ্রবাহ। এই চলমান রূপের সৌন্দর্য বা মহিমা এমন করে পরিস্ফুট করা উচিত যা কোনো বাক্যের সাহায্য ব্যতীত আপনাকে সম্পূর্ণ সার্থক করতে পারে। তার নিজের ভাষার মাথার উপরে আর একটি ভাষা কেবলি চোখে আঙুল দিয়ে মানে বুঝিয়ে যদি দেয় তবে সেটাতে তার পঙ্গুতা প্রকাশ পায়। সুরের চলমান ধারার সঙ্গীত যেমন বিনা বাক্যেই আপন মাহাত্ম্য লাভ করতে পারে তেমনি রূপের চলৎপ্রবাহ কেন একটি স্বতন্ত্র রসসৃষ্টিরূপে উন্মেষিত হবে না? হয় না যে সে কেবল সৃষ্টিকর্তার অভাবে এবং অলসচিত্ত জনসাধারণের মূঢ়তায়, তারা আনন্দ পাবার অধিকারী নয় বলেই চমক পাবার নেশায় ডোবে।"

ছায়াচিত্রের পক্ষে সাহিত্যের চাটুবৃত্তি শিল্পসম্মত নয়, বাক্যের সাহায্য ব্যতীতই ছায়াচিত্রের সার্থকতালাভ উচিত, রবীন্দ্রনাথের এই দুই কথার নানা ব্যাখ্যা অনুমান করা হয়েছে। সাহিত্যের চাটুবৃত্তি বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝিয়েছিলেন? সাহিত্য-উপন্যাস, নাটক, গল্প,অবলম্বন করে ছায়াচিত্র তৈরি করা? বাক্যের সাহায্য ব্যতীত? রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে এই কথা লিখছেন, ১৯২৯ সালে, তখন ছায়াচিত্রে বাক্যের ব্যবহার আরম্ভ হয় নি, সেটা নির্বাক ছায়াচিত্রের সময়। ২৯ ডিসেম্বর ১৯২৮ এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসে (মিনার্ভা) মেলডি অফ লাভ প্রথম সবাক পূর্ণাঙ্গ ছায়াচিত্র কলকাতায় দেখান হয় বটে, তবে সবাক বাংলা ছবি প্রথম মুক্তি পাবে ক্রাউনে (শ্রী) জামাইষষ্ঠী ২৫ এপ্রিল ১৯৩১। 'তার নিজের ভাষার মাথার উপরে আর একটি ভাষা কেবলি চোখে আঙুল দিয়ে মানে বুঝিয়ে যদি দেয়'—বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছিলেন নির্বাক ছায়াচিত্রের সাবটাইটেল দেওয়ার রীতি। সেই রীতিই রবীন্দ্রনাথের কাছে অস্তিকর ছিল, সবাক ছায়াচিত্র সম্পর্কে এটা বলা হয় নি। সাবটাইটেল করাকেই তিনি বলেছিলেন সাহিত্যের চাটুবৃত্তি।

১৯১৯-১৯২৯ পর্যন্ত বাংলা যেসব ছায়াচিত্র তৈরি হয়েছিল তার সব সাহিত্য অবলম্বন করেই, গিরিশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথই ছিলেন ছায়াচিত্রের প্রধান অবলম্বন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০১ সালেই তাঁর ক্লাসিক থিয়েটারের ভ্রমর, আলিবাবা, হরিরাজ, দোললীলা, বুদ্ধ, সীতারাম, সরলা

নাটকের ছোট ছোট মঞ্চস্থ দৃশ্যই ম্যাডান কোম্পানির সাহায্যে ছায়াচিত্রে তুলে দেখাতেন স্টেজেই, তখন থেকেই নাটক ছায়াচিত্রের প্রধান অবলম্বন। ১৯২৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল এই কটা বাংলা ছায়াচিত্র: দেবদাস (শরৎচন্দ্র), ভ্রান্তি (গিরিশচন্দ্র), বামন অবতার, নিষিদ্ধ ফল (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়), ম্যারেজ টনিক, সতী সীতা, রাতকানা, সরলা (তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়), কেলোর কীর্তি, বিষবৃক্ষ (বঙ্কিমচন্দ্র), শাস্তি কি শাস্তি (গিরিশচন্দ্র), বিচারক এবং বিসর্জন (রবীন্দ্রনাথ)। বিসর্জন ছায়াচিত্রটি বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। বিসর্জন নাটকটি কলকাতার পাবলিক স্টেজে খোলা যায় নি, কারণ মনে করা হয়, কালী প্রতিমা বিসর্জন হিন্দু দর্শককে অসন্তুষ্ট করবে এই আশঙ্কা। ১৮৯০ সালে রচিত এই নাটকটি পাবলিক স্টেজে (এম্পায়ার) মঞ্চস্থ হল ১৯২৩ সালে, রবীন্দ্রনাথেরই প্রযোজনায়। কিন্তু তার আগেই ছায়াচিত্র জগতে বিসর্জন নাটকে আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। ১৯১৮ সালে হায়দ্রাবাদ নিজাম আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ম্যাডান থিয়েটার্সের কাছে পরামর্শ এবং আবেদন পাঠান ছায়াচিত্রের জন্য। ম্যাডান এই ডিজিকে ছায়াচিত্র করবার জন্য নিয়োগ করতে পারেন জানান, কিন্তু এক শর্তে। ডিজি যদি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বিসর্জন নাটকের ছায়াচিত্র করার অনুমতি আনতে পারেন, তবেই তিনি ম্যাডান থিয়েটার্সে যোগ দিতে পারেন। ডিজি রবীন্দ্রনাথের অনুমতি লাভও করেন। কিন্তু ডিজি শেষ পর্যন্ত ম্যাডানে আসেন নি। নিজেই তৈরি করলেন দি ইণ্ডো বৃটিশ ফিল্ম কোম্পানি। এই কোম্পানি কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিসর্জন করেন নি। রবীন্দ্রনাথ ছায়াচিত্র করার জন্য কোনো অর্থ দাবি করেন নি। কিন্তু মহিলাশিল্পীর অভাবে ছায়াচিত্রটি তোলা যায় নি।

১৯২৮ সালের বিসর্জন সম্পর্কে গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ জানিয়েছেন 'সোনার বাগ' গ্রন্থে:

বিসর্জন ॥ ওরিয়েন্ট পিকচার্স কর্পোরেশন।

কাহিনী: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭ রীলের এই ছবির মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন, বেগম জুবিদা বানু ও সুলোচনা। এই ছবির প্রথম মুক্তির তারিখ সঠিক বলা যাচ্ছে না। তবে বাঙলার কথা পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি অনুসারে জানা যায় ২৩ ও ২৪শে ডিসেম্বর (১৯২৮) দুপুর ২টো, সন্ধ্যে ৬টা, রাত ৯'৩০ মিনিটে ক্রাউন থিয়েটারে, আবার ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ ইম্পিরিয়াল থিয়েটারে সন্ধ্যে ৬টা ও রাত ৯'৩০ মিনিটে এই ছবি দেখান হয়েছিল। পরে

ইংল্যাণ্ডে ও ইউরোপের নানা স্থানে এই ছবি দেখান হয় ও প্রশংসা লাভ করে।

১৯২৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল আর একটি ছবি বিচারক। ইস্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেটের প্রযোজনায় নীতিন বসুর ক্যামেরায়, শিশিরকুমার ভাদুড়ির নির্দেশনায়। ক্ষীরোদার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কঙ্কাবতী শাহু (১৯০৩-১৯৩১), বাংলা স্টেজে প্রথম গ্র্যাজুয়েট মহিলা শিল্পী। সেই বছরই তাঁর স্টেজে আবির্ভাব। অভিনয়ে আর ছিলেন শেফালিকা, শিশির ভাদুড়ি, বিশ্বনাথ ভাদুড়ি, যোগেশ চৌধুরি। বিচারক মুক্তি পেয়েছিল ক্রাউন সিনেমায়। মুক্তি পাওয়ার পর কদিনের মধ্যেই অশ্লীলতার অভিযোগে বন্ধ হয়ে যায়। আবার মুক্তি পায় ১৯৩২ সালের ১২ই মার্চ লিবার্টি সিনেমায়। চিত্রলেখা পত্রিকায় লেখা হয়েছিল Bengal Board of Censor-এর বিচারের বিরুদ্ধে Special Board বসানো উচিত, বিচারক অশ্লীল কিনা বিচারের জন্য।

রবীন্দ্রনাথের রচনা অবলম্বনে প্রথম ছায়াচিত্র মুক্তিলাভ করেছিল ১৯২৩ সালে, মানভঞ্জন। প্রযোজনায় তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি, নির্দেশনায় নরেশচন্দ্র মিত্র, ক্যামেরায় ননী সান্যাল, অভিনয়ে নরেশ মিত্র (গোপীনাথ), ইন্দু মুখোপাধ্যায় (গোপীনাথের বন্ধু) তিনকড়ি চক্রবর্তী (গোমস্তা), সোনা, লীলা, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (জনতার একজন)। পরে ১৯২৪ সালে স্টার থিয়েটারেও মানভঞ্জন দেখান হয়। নাচঘর ১৩৩১ আশ্বিনে ছায়াচিত্রটির নিন্দা করে লিখেছিল, "গল্পটি তাজমহল এমন Crude করিয়া ফিল্মে দেখাইলেন যে তার ভিতরকার রস শুকাইয়া ঝরিয়া গেল।"

১৯২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক :

Dr Tagore As Movie
Star
—o—
Family also to take Part
TO BE SHOT AT SANTINIKETAN
CALCUTTA, DECEMBER—4

Dr Rabindranath Tagore appears for the first time on the Screen in the leading part of the film version of the poet's latest drama entitled "Tapati", which will be produeed by the British Dominion Films Company under the direction of Mr Dhiren Gangopadhyay.

Many members of Dr Tagore's family and his students take part in the flim which will be shot at Santiniketan.

The Scenario has been written by Dr Tagore himself and it is hoped the picture will be of eight reels and will he finished before the year.

১৯২৯ সালের নভেম্বরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করা উচিত নয় ছায়াচিত্রের, ডিসেম্বরে প্রস্তুত হচ্ছেন তপতীর ছায়াচিত্রে স্বয়ং অবতীর্ণ হতে। গগনেন্দ্রনাথের অনুরোধে তিনি পুরনো নাটক রাজা ও রাণী মার্জিত করে দিয়েছিলেন 'ভৈরবের বলি'। নাটক মঞ্চস্থ হবার পর নাটকটি ঢেলে সাজালেন আগষ্ট মাসের মধ্যেই, 'তপতী'রূপে। পাবলিক স্টেজে এই প্লে খোলা হবে ২৫ ডিসেম্বর। কর্ণওয়ালিশ মঞ্চে, নাট্যনিকেতনের প্রযোজনায়, অভিনয় করবেন শিশিরকুমার, কঙ্কাবতী,প্রভা, জীবন গাঙ্গুলি। সেপ্টেম্বরে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অভিনয় করেছেন ২৬,২৮,২৯ সেপ্টেম্বর আর ১ অক্টোবর বিক্রমের ভূমিকায়। সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুতি চলছে তপতীর ছায়াচিত্রের। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ছবিটি হয় নি।

না হলেও, ১৯২৯ সালে ছায়াচিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট উদার। ১৯২৩ সালে মানভঞ্জন করার, ১৯২৮ সালে বিসর্জন আর বিচারক করার অনুমতি দিয়েছেন, ১৯২৯ সালে তপতী ছায়াচিত্রে অবতীর্ণ হবেন। এই রবীন্দ্রনাথ ১৯২০ সালে সিনেমা সম্পর্কে বেশ কটূক্তি করেছিলেন, এবং সেই রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করা যাক।

১৯২০ সালে ইংল্যাণ্ডে বেড়ানোর সময় রবীন্দ্রনাথ রাস্তায় একদিন বিখ্যাত সিনেমা অভিনেত্রী মেরী পিকফোর্ডকে দেখেন। অভিনেত্রীকে দেখার জন্য রাস্তায় ভিড় জমে যায়। রবীন্দ্রনাথেরও কৌতূহল জন্মায়, কাকে দেখার জন্য এত ভিড়। এবিষয়ে শ্রাবণ ১৩২৭ শান্তিনিকেতন পত্রিকা লেখেন :

"এই জনতার কারণ জানিবার জন্য পূজনীয় গুরুদেব সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন। জনতার মধ্যে কেহই জানিতে পারেন নাই যে ভারতবর্ষের কবি তাহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন।

"সেখান হইতে বাসায় ফিরিবার পথে প্রবেশদ্বারে Daily News-এর এক সংবাদদাতা তাঁহার নিকট গিয়া জনতার কারণ জানাইল। Cinema-র অভিনেত্রী দেখিবার জন্য এত জনতা এত আগ্রহ সম্বন্ধে গুরুদেবের মত জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, 'এই জনতার উপর যিনি এমন প্রভাব বিস্তার করেছেন, তিনি আমার পরিচিত নন। কাজেই তাঁর সম্বন্ধে অসম্মানসূচক কোনো কথা বলা আমার উচিত নয়। আমাকে না বললে আমি কখনও এই ভীড়ের কারণ ভাবতেও পারতুম না। আমার এই ধারণা ছিল যে, সংসারের কোলাহলের বাইরে যেখানে আত্মার ক্ষুধার অন্ন প্রস্তুত হয় সেখানেই আপনা হতে সরল অন্তঃকরণ জনসাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের পবিত্রাত্মা সাধু পুরুষের দর্শন পাবার জন্য লোকের ভীড় হয়। জাপানে Cherry ফুল ফোটবার সময় আবালবৃদ্ধবনিতা এসে ভীড় করে দাঁড়ায়। Yokohama-র দিনমজুরও অবকাশের সময় সমুদ্রতীরে বনের মধ্যে গিয়ে বিশ্রাম করে, কিন্তু কোনো উন্মত্ত আনন্দস্রোতে গা ঢেলে দেবার জন্যে নয়, নিভৃতে প্রাকৃতিক আনন্দ উপভোগ করবার জন্য। অজানা সুদূরের দিকে ছুটে যাবার জন্য মানবসত্তার যে প্রবণতা আছে, তার আভাস আমি ঐ জাপানের দিনমজুরদের অবকাশ যাপনের ভিতর স্বাভাবিক ব্যাকুলতায় দেখতে পেয়েছিলুম।

"প্রাচীনকালে গ্রীকদেশে উচ্চ অঙ্গের নাটকাভিনয় দেখবার জন্য কেবলমাত্র সুশিক্ষিত লোক নয় অশিক্ষিত জনসাধারণও এসে সমাগত হত। আর সেই উচ্চ সাহিত্যের রস সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপভোগ করত। কিন্তু ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখের চরিতার্থ করবার এই যে একান্ত আগ্রহ, তা দেখে আমার চিত্ত বড়ো ক্ষুব্ধ হয়। যে পূজার পাত্র তার মধ্যে যদি একটি চিরন্তন মাহাত্ম্যের আদর্শ থাকে, তবেই জনসাধারণ তাকে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করে। একেই বলে যথার্থ বীরপূজা। আর এই আদর্শই দেশের চিত্তকে জাগিয়ে তুলতে পারে।"

মেরী পিকফোর্ডকে দেখতে ভিড় হয়, এতে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, এই ভিড়কে যথার্থ বীরপূজা মনে হয় নি। সিনেমা অভিনেত্রীর মধ্যে চিরন্তন মাহাত্ম্যের আদর্শ নেই, এটা কেবল ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখের চরিতার্থতা বলে তাঁর মনে হয়েছিল। মেরী পিকফোর্ড সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কটাক্ষ কলকাতার সংবাদপত্রে বিরূপ সমালোচনার কারণ হয়েছিল, সেটা জেনে ক্রুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠিতে জানালেন, ২৮ আগস্ট ১৯২০ :

"Mary Pickford-এর বিষয়ে Daily News এ আমরা যে Interview বেরিয়েছিল সে সম্বন্ধে Statesman, Englishman আমাকে গাল দিয়ে প্রবন্ধ লিখেচে তোমার চিঠিতে জানতে পারলুম। ভারতবর্ষ থেকে তোমরা একটা কথা ঠিক বুঝতে পার না যে ঐ সব কাগজের অস্তিত্ব সমস্ত পৃথিবীর কাছে কতই অকিঞ্চিৎকর। ভারতবর্ষের মশার ডাক যেমন এখান থেকে একেবারেই শোনা যায় না ঐ সব কাগজের গুঞ্জনধ্বনিও তেমনি। মেরী পিকফোর্ড সম্বন্ধে আমার মন্তব্য নিয়ে এখানকার লোকে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা করে নি, বরঞ্চ প্রশংসা করেছিল।"

এর তিন বছর পরও, ১৯২৩ সালে মানভঞ্জন হয়ে যাওয়ার পরও, ছায়াচিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত পালটায় নি। জাভা যাওয়ার পথে, ক্র্যাকোভিয়া জাহাজে, ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ তিনি লিখেছেন, (যাত্রী) : "এবার জাহাজে সিনেমা অভিনয় দেখা আমার ভাগ্যে ঘটেছিল। দেখলুম, তার প্রধান জিনিসটাই হচ্ছে দ্রুত লয়। ঘটনার দ্রুততা বারে বারে চমক লাগিয়ে দিচ্ছে। এই সিনেমা আজকালকার দিনে সর্বসাধারণের একটি প্রকাণ্ড নেশা। ছেলে বুড়ো সকলকেই প্রতিদিন এতে মাতিয়ে রেখেছে। তার মানে হচ্ছে সকল বিভাগেই বর্তমানযুগে কলার চেয়ে কারদানি বড়ো হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনসাধনের মুগ্ধদৃষ্টি কারদানিকেই পছন্দ করে। সিদ্ধি, ইংরেজিতে যাকে সাক্‌সেস বলে, তার প্রধান বাহন হচ্ছে দ্রুত নৈপুণ্য। পাপকর্মের মধ্য দিয়েও সেই নৈপুণ্যের লীলাদৃশ্য আজ সকলের কাছে উপাদেয়।"

এই দ্রুতগতির প্রসঙ্গেই আবার বললেন জাভাযাত্রীর পত্রে, "এখন হ্যামলেটের অভিনয় সম্ভব হল। হ্যামলেটের সিনেমার হল জিত।"

মানভঞ্জন গল্পটি অবলম্বনে ১৯২৩ সালে একটি চিত্র হয়েছিল, আবার হল ১৯৩০ সালে। ম্যাডান থিয়েটার্সের প্রয়োজনায় মধু বসু পরিচালনা করলেন। ১৩৪৮ রবীন্দ্রজন্মোৎসব সংখ্যার দীপালিতে মধু বসু লিখেছেন, "চিত্রনাট্যটি সম্পূর্ণ হবার পর গুরুদেবের···শরণাপন্ন হই। তিনি পরম যত্নে পরম স্নেহে গিরিবালার সিনারিওটি আদ্যোপান্ত সংশোধন করে দেন।···ক্রাউন সিনেমায় গিরিবালা চিত্রের উদ্বোধন দিবসে গুরুদেব স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং ছবি দেখে খুশী হয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেন।"

ক্যামেরায় ছিলেন যতীন দাস। অভিনয়ে ধীরাজ ভট্টাচার্য, নরেশ মিত্র, ললিতা দেবী, শান্তি গুপ্তা, লীলাবতী, তিনকড়ি চক্রবর্তী। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ ক্রাউন সিনেমায় উদ্বোধন হয় ৮ রীলের এই ছবিটির। প্রেস শো হয়েছিল ম্যাডান থিয়েটার এণ্ড প্লেস অফ ভ্যারাইটিজ (এলিট)-এ ১৩ ফেব্রুয়ারি। ছবিটি কাগজে প্রশংসিত হয়েছিল, আলোকপাত এবং অভিনয়, বিশেষ করে ধীরাজ ভট্টাচার্যের অভিনয়।

২৬ জুলাই ১৯৩০ ক্রাউনে মুক্তি পেল দালিয়া। ম্যাডান থিয়েটার্সের প্রযোজনা। মধু বসুর পরিচালনা করার কথা ছিল, কিন্তু তৎকালীন সংবাদপত্রে বা মাসিকপত্রে মধু বসুর কোন উল্লেখ নেই। অভিনয়ে ছিলেন বি. রাজ হনস্ (রহমত আলি), রমলা, রুবি, কার্তিক রায়। ৬ রীলের এই ছবির ক্যামেরাম্যান ছিলেন যতীন দাস। চিত্রলেখা পত্রিকা ছবিটিকে অত্যন্ত তিরস্কার করেছিল, "রবীন্দ্রনাথের দালিয়া চিত্রে রূপ দিতে ম্যাডান কোম্পানি অর্থব্যয়ে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। কিন্তু চিত্র-পরিচালক মহাশয়ের ব্রহ্মদেশের আচার-ব্যাহার, সাজ-পোশাক, বাড়ী-ঘরের কোন ধারণা না থাকায় ছবিখানির ভিতর কোথাও ব্রহ্মদেশের আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয় নাই। সেইজন্য ছবিখানি সাধারণে সাদরে গ্রহণ করেন নাই। চিত্র-নাট্য লেখক মহাশয় গল্পের সামঞ্জস্য সর্বত্রই নষ্ট করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকার অভিনয় নিম্নশ্রেণীর। জেলের ভূমিকায় অভিনয় কোনোরূপে সহনীয়। আলোক-চিত্রকর তাঁহার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। পাঠলিপি সুলিখিত হওয়া উচিত ছিল।"

দালিয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিছু দুর্বলতা ছিল। তিনি মনে করতেন দালিয়ার ভালো ছায়াচিত্র হওয়া সম্ভব। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জীতে জানিয়েছেন ১৯৩৩ সালের ১৮ জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় মধু বসু পরিচালিত দালিয়া দেখেন। এটা নিশ্চয়ই ১৯৩০ সালের দালিয়া ছায়াচিত্রটি। ১৯৩৩-এর মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ দেখেন এম্পায়ারে দালিয়ার অপরেশ মুখোপাধ্যায়-কৃত এবং রবীন্দ্রসংশোধিত নাট্যরূপ। ১৯৩৬ সালে মধু বসু সবাক দালিয়া করার চেষ্টা করবেন। ১৯৩৬ সালেই দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ দালিয়া ছায়াচিত্রের জন্য একটি খসড়া করছেন। খসড়াটি পাওয়া যাবে প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের রবিচ্ছবি গ্রন্থে 'অলিখিত নাটক' রচনায়।

প্রভাতচন্দ্র শান্তিনিকেতনে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথের ভাষণের শ্রুতিলিখন

নিতেন। এর জন্য একটি খাতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তিনি আবিষ্কার করেন, সেই খাতার দুই পাতায় একটি নাটকের খসড়া। এবিষয়ে তিনি রথীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করাতে রথীন্দ্রনাথ জানান, 'গুরুদেবকে বিশেষ-ভাবে সিনেমার উপযোগী একটি নাটক লিখিয়ে নিতে রবীন্দ্রনাথের নিকট ঘন ঘন অনুরোধ কোনো সময় আসে। তিনি গুরুদেবকে এই নির্বন্ধাতিশয্যের কথা জানান এবং তার ফলেই সম্ভবত এই নাটকের পরিকল্পনা। রাজর্ষি উপন্যাসের শেষভাগের সঙ্গে দালিয়ার গল্পাংশ যোগ করলে যে একটি নাটকের উপযোগী চমৎকার উপাদান পাওয়া যেতে পারে, এই সম্বন্ধে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন।' রবীন্দ্রনাথের করা খসড়াটি ছিল এই :

প্রথম অংশ

রাজর্ষি বিংশ পরিচ্ছেদ ৭৮ পৃঃ

বিজয়গড়ের দুর্গ

গোবিন্দমাণিক্যকে রাজ্যচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে রঘুপতির মোগল সৈন্যের অনুসরণ।

দুর্গ আক্রমণকারী সুজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ৮১ পৃঃ

বিশ্বাসপরায়ণ বিক্রমসিংহের নির্বুদ্ধিতায় রঘুপতির কাছে দুর্গের সুড়ঙ্গপথের সংবাদ আবিষ্কৃত। ২১ পরিচ্ছেদে ৮৩ পৃঃ

সুজা যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী। দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ৮৮

ব্রাহ্মণের চক্রান্তে গোপন সুড়ঙ্গপথ দিয়ে সুজার পলায়ন। ২৪ পরিচ্ছেদ ১১২ পৃঃ ২৮ পরিচ্ছেদ—রাজমহলে সুজা। রঘুপতির সঙ্গে কথাবার্তা। মোগল সৈন্য নিয়ে ত্রিপুরা আক্রমণে রঘুপতির যাত্রা।

দ্বিতীয় অংশ

১৭১/১৮৬ পৃঃ ৪২/৪৪ পরিচ্ছেদ। রাজ্যত্যাগী গোবিন্দমাণিক্য চট্টগ্রামে আরাকান রাজার অধীনে। মহাজী নদীর ধারে কুটীরে তাঁর বাস। এদিকে শাহসুজা আরংজেবের সৈন্য কর্তৃক তাড়িত। তাঁর তিন মেয়েকে ছেলের বেশে সঙ্গে নিয়েছেন। স্থির করেছেন চট্টগ্রামের বন্দরে জাহাজ নিয়ে মক্কায় যাবেন।

বনে কাঠুরিয়া ও শিকারীর দৃশ্য। তারা গোবিন্দমাণিক্যের কুটীরের কথা বলে দেয়।

ফকির বেশে শাহসুজা গোবিন্দমাণিক্যের দুর্গের কাছে উপস্থিত। গোবিন্দ-মাণিক্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ১৮৯/১৯৩/১৯৪ আরাকানে সুজার প্রস্থান।

তৃতীয় অংশ

গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড। ৭৯ পৃঃ—

আরাকানরাজের ইচ্ছা তাঁর ছেলের সঙ্গে সুজার বড়ো দুই কন্যার বিবাহ হয়। সুজা অসম্মত, রাজা ক্রুদ্ধ।

ছল করে সুজাকে নৌকাবিহারে রাজার নিমন্ত্রণ। স্থির করেছিলেন ফুটো নৌকোয় সুজাকে ডুবিয়ে দিয়ে মেয়ে তিনটিকে নেবেন।

বিপদের সময় কনিষ্ঠা কন্যাকে সুজা স্বহস্তে জলে ফেলে দেন। জ্যেষ্ঠা আত্মহত্যা করে মরে। সুজার কর্মচারী রহমৎ আলি জুলিখাকে নিয়ে সাঁতার দিয়ে পালিয়ে যায়।

চতুর্থ অংশ

তারপর দীর্ঘকাল গেছে। আমিনাকে আরাকানী ধীবর উদ্ধার করে মানুষ করেছে। তাকে ডাকে তিন্নি বলে। পাড়ার সবাই তাকে জলদেবী বলে পূজা করে। মাছ ধরতে যাবার সময় নৈবেদ্য দেয়, ঝড়ঝাপটার দিনে আশীর্বাদ নিতে আসে।

সেইরকম একটা পূজারী জনতার দৃশ্য অন্তে আমিনার সঙ্গে জুলিখার সাক্ষাৎ। তাদের মধ্যে দালিয়া। ৮০ হতে ৮৪ পৃঃ।

জুলিখার সঙ্গে রহমতের পরামর্শ, আমিনাকে দিয়ে আরাকানের যুবরাজকে মারতে চায়। আমিনা ও দালিয়ার ভাই নিয়ে কথাবার্তা। ৮৭ পৃঃ আমিনা ভক্তদের জানিয়েছে যে, সে সমুদ্রে ফিরে যাবে। বিদায় সম্ভাবনায় সকলের শোক। শাঁখ কড়ি ঝিনুক প্রবাল প্রভৃতি অর্ঘ্য দান। শেষ দৃশ্য ৮৭/৮৮/৮৯ পৃঃ।

১৯৩৬ সালে মধু বসু যখন সবাক দালিয়া করতে চান, তখন রবীন্দ্রনাথ হয়ত এই খসড়াটি করেছিলেন।

রবীন্দ্ররচনা অবলম্বনে, নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগে, শেষ ছবি, নৌকাডুবি। কর্ণওয়ালিশে মুক্তি পেয়েছিল ৩ জুন ১৯৩২ ম্যাডান কোম্পানির এই ছবিটি। পরিচালনায় নরেশ মিত্র, অভিনয়ে নরেশ মিত্র, শান্তি গুপ্তা, ধীরাজ ভট্টাচার্য,

কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, কনকনারায়ণ ভূপ, শিশুবালা, সুনীলা। ১৯ রীলের এই ছবি দেখে চিত্রলেখা লিখেছিল, 'এই দীর্ঘ সময় আমাদের যে কি ভাবে কেটেছে তা ভগবানই জানেন। শিশির পত্রিকা লিখেছিল 'কাশীতে কি ভাবে স্টীমারে চড়িয়া যাওয়া যায় তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।' অভিনয় ও প্রযোজনার প্রশংসা করে শিশির লিখল 'চলচ্চিত্রের উপযোগী action এই উপন্যাসে নাই।'

১৯৩০ সালটি ফিল্মের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রজীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সালে তিনি জার্মানী আর রাশিয়া বেড়াতে যান। রবীন্দ্রনাথ যে ছায়াচিত্র বিশেষ দেখতেন তার কোন তথ্য পাওয়া যায় না, তবুও জার্মানীর ইউফা কোম্পানি (বর্তমানে পূর্ব বার্লিনে) কেন যে তাঁকে ফিল্মের সিনারিও লিখতে বলে, বোঝা দুষ্কর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রজন্মশত-বার্ষিকীতে ম্যাক্সমুলার ভবন থেকে প্রকাশিত Rabindranath Tagore in Germany-তে জানান হয়েছে :

Tagore was very much impressed by this Play (passion play) and when he was asked by a German film company for a script dealing with Indian life, he composed this Poem (the Child) in one night in Berlin···the plan of producing a film based on a script by Tagore never materialiged.

২৪ জুলাই ১৯৩০ অমিয় চক্রবর্তী একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন (কার্তিক ১৩৩৭ প্রবাসীতে প্রকাশিত), মিউনিক থেকে, "রবীন্দ্রনাথ সারাদিন ধরে ইংরেজিতে একটি নূতন রকম টেকনিকে ফিল্মের জন্য নাটক লিখছেন। ছবির মতো এও তাঁর নূতন সৃষ্টির নেশা।" এই সময় লেখা রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটক পাওয়া যায় না অতএব অনুমান করা যায় The Child-কেই অমিয় চক্রবর্তী বলছেন নূতন টেকনিকে ফিল্মের জন্য নাটক। টেকনিকে নূতন হলেও, The Child কবিতাটিতে ছবির পর ছবির স্রোত থাকলেও, ভারতীয় জীবনের একটি প্রতিচ্ছবি কবিতাটিতে পাওয়া গেলেও, একটি পূর্ণাঙ্গ ছায়াচিত্র এই কবিতা অবলম্বনে অসম্ভব ছিল। পরবর্তী কালে শিশুতীর্থ (The Child) শান্তিনিকেতনে অভিনীত হয়েছিল নৃত্যনাট্যে, কিন্তু ইউফা কোম্পানি এই কবিতা থেকে ছায়াচিত্র তৈরি করতে সাহসী হয় নি।

জার্মানি থেকে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গেলে সেখানকার চলচ্চিত্রকর্মীরাও

রবীন্দ্রনাথের সিনারিওতে আগ্রহ দেখায়। মস্কো থেকে সরকারী নথিপত্রের সংকলনে (সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ) দেখা যাচ্ছে :

"১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ : সন্ধ্যায় চলচ্চিত্রকর্মীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চলচ্চিত্রকর্মীদের আলাপের ব্যবস্থা করে। কবিকে 'ব্যাটলশিপ পতিওমকিন' আর 'পুরাতন ও নূতন' ছবিদুটির অংশবিশেষ দেখান হয়। দুটি ছবিই চলচ্চিত্রকার স. ম. আইজেনস্টাইনের তোলা দুটি ছবিই রবীন্দ্রনাথের খুবই ভাল লাগে।

"তারপর রবীন্দ্রনাথ ও সোভিয়েত চলচ্চিত্রকর্মীদের মধ্যে আলোচনা হয়। তাতে রবীন্দ্রনাথ রচিত সিনারিও নিয়ে চলচ্চিত্র তোলার কথাও ওঠে। উপস্থিত সকলে তাঁর রচিত সিনারিওতে অত্যন্ত আগ্রহ অনুভব করেন।"

ইউফা স্টুডিওতে রবীন্দ্রনাথ গান ও আবৃত্তির চিত্রগ্রহণ করা হয়, ১৯৩১ সালেই কলকাতায় রবীন্দ্রনাথকে সেই ছবি দেখান হয়। The Child কবিতাটিই রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করেছিলেন কিনা জানা যায় না।

১৯২০ সালে সিনেমাকে রবীন্দ্রনাথের কাছে মনে হয়েছিল, ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখের চরিতার্থতা। ১৯২৯ সালে মনে হয়েছিল অলসচিত্ত জনসাধারণের মূঢ়তা। ১৯২৯ সালেই কিন্তু তিনি তপতী ছায়াচিত্রে অভিনয়ে রাজি হয়েছেন, ১৯৩০ সালে The Child লিখেছেন সিনারিও উদ্দেশ্যে, আইজেন-স্টাইনের ছবি দেখেছেন, আশা করা যায়, সিনেমাকে শিল্পকর্ম হিসেবে তিনি মান্য করছেন। ১৯৩২ সালে জোড়াসাঁকোতে অভিনীত নটীর পূজা চলচ্চিত্রে গ্রহণ করলেন নিউ থিয়েটার্স। ওই বছরই তিনি শ্যামবাজারের একটি নূতন চিত্রগৃহের নামকরণ করলেন রূপবাণী, চিত্রগৃহটির উদ্‌বোধন উপলক্ষ্যে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখলেন, চিররূপের বাণী। সেলুলয়েডের সবাক জীবন বন্দিত হলো এইভাবে :

দেহমুক্ত রূপের সঙ্গে যুগলমিলন হল দেহমুক্ত বাণীর
প্রাণতরঙ্গিনীর তীরে, দেহনিকেতনের প্রাঙ্গণে।

ওই বছর ২৮মে মুক্তি পেয়েছিল চিরকুমার সভা, চিত্রায়। নিউ থিয়েটার্সের এই ছবি পরিচালনা করেছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, ক্যামেরায় নীতিন বসু, শব্দগ্রহণে মুকুল বসু, সঙ্গীত পরিচালনায় রাইচাঁদ বড়াল। অভিনয়ে তিনকড়ি চক্রবর্তী (অক্ষয়), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (রসিক), অমর মল্লিক (চন্দ্র), দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (পূর্ণ) ইন্দু মুখোপাধ্যায় (শ্রীশ), ফণি

বর্মা (বিপিন), নিভাননী (শৈলবালা), সুনীতিবালা (নীরবালা), অন্নপূর্ণা (নৃপবালা), মলিনা, চানী দত্ত, অনুপমা।

কয়েকদিন আগে ২২শে মার্চ, চিত্রাতেই মুক্তি পেয়েছিল, নিউ থিয়েটার্সের আর একটি ছবি, নটীর পূজা। ১৯৩১ সালের ২৮,২৯,৩০ ডিসেম্বর নটীর পূজা অভিনয় করেছিলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমিকসঙ্ঘের সভ্যরা, জোড়াসাঁকোতে। সেই অভিনয় তুলেছিলেন নিউ থিয়েটার্স। পুণ্যস্মৃতিতে সীতা দেবী লিখছেন তাঁর ১৯৩২-এর ফেব্রুয়ারির ডায়েরিতে, "সেইদিন নটীর পূজা ফিল্মটি তাঁহাকে দেখাইবার জন্য নিউ থিয়েটার্সের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নাতনীস্থানীয়া কয়েকটি বালিকা উপস্থিত দেখিয়া কবি বলিলেন, 'এদের কিছু খাইয়ে দিলে হত। আচ্ছা চলো বায়োস্কোপ দেখিয়ে আনি।' রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন ছবিখানা দেখাইতে।"

ফেব্রুয়ারি মাসের ডায়েরি। চিত্রায় মুক্তি পেয়েছিল মার্চে। হয় তো কোন প্রাইভেট শো-তে নটীর পূজা দেখার কাহিনী এটি। রবীন্দ্রনাথ এখনও ছায়াচিত্রকে বায়োস্কোপ বলছেন, আর বায়োস্কোপকে ভাবছেন নাতনীদের খাইয়ে আনার বিকল্প হিসেবে।

সেই কৌতুকের সুরই সিনেমা সম্পর্কে ১৯৩২ লেখা দুইবোনে। চঞ্চল ঊর্মিমালার চাঞ্চল্যের বর্ণনায় আছে, "ময়দানে ফুটবল দেখতে যেতে তার অসীম আগ্রহ, সিনেমা দেখাটাকে সে অবজ্ঞা করে না।" বিষণ্ণ ঊর্মিকে উজ্জীবিত করার জন্য "শশাঙ্ক আসে মোহনবাগান ফুটবল ম্যাচের প্রলোভন নিয়ে, ব্যর্থ হয়। পেন্‌সিলের দাগ-দেওয়া খবরের কাগজ মেলে দেখায় বিজ্ঞাপনে চার্লি চ্যাপলিনের নাম, ফল হয় না কিছুই।" চলচ্চিত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এখনও ফুটবল খেলার সগোত্র।

কিন্তু সিনেমাকে একেবারে তাচ্ছিল্য হয় তো রবীন্দ্রনাথ করতেন না। চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য বিশেষ আদর পাবে কিনা এ সন্দেহ তাঁর ছিল, আর তাই তিনি ২১ জানুয়ারি ১৯৩৮ অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠি লিখছেন, "সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ ফিশার বলেছেন, এর পরিচয় যদি সিনেমাযোগে সমুদ্রপারে পাঠানো যায় সে এক বহুমূল্য পদার্থ হবে।"

সেই ১৯৩৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল চোখের বালি আর গোরা। চোখের বালি পরিচালনা করেছিলেন সতু সেন। 'আত্মস্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' গ্রন্থে

সতু সেন জানিয়েছেন, 'চোখের বালি আত্মপ্রকাশ করলে চলচ্চিত্রটি দর্শনান্তে কবি আমাকে ভূয়সী অভিনন্দন জানিয়ে একটি পত্র দিয়েছিলেন।' সতু সেন চিঠিটি হারিয়ে ফেলেন। অভিনয়ে ছিলেন সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা রায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, রমা ব্যানার্জী, ডঃ হরেন মুখার্জি, ছবি বিশ্বাস, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শরৎ সুর, অত্রি গুহঠাকুরতা। ক্যামেরায় ছিলেন ননী সান্যাল, সঙ্গীত পরিচালনায়, অনাদি ঘোষ দস্তিদার।

যেদিন (৩০ জুলাই) শ্রীতে মুক্তি পায় চোখের বালি, সেদিনই গোরা মুক্তি পায় চিত্রায়। পরিচালনায় নরেশ মিত্র, ক্যামেরায় যশোবন্ত ওয়ালীকার, সঙ্গীত পরিচালনায় নজরুল ইসলাম, শব্দগ্রহণে সত্যেন দাশগুপ্ত। অভিনয়ে জীবন গাঙ্গুলি, রাণীবালা, প্রতিমা দাশগুপ্তা, রমলা, রাজলক্ষ্মী, বেণুবালা, মোহন ঘোষাল, নরেশ মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রবি রায়, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ললিত মিত্র, বিপিন গুপ্ত ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করেই ছবিগুলো করা হতো। পৌষ ১৩৫৭ বসুমতীতে নরেশ মিত্র জানিয়েছেন, "১৯৩৭ সালের শেষ দিকে ডাঃ ঠাকুরের ছোটগল্প কঙ্কাল পাঠ করার পর আমার মনে এই ভাবের (১৯৫০ তোলা কঙ্কাল ছবির) উদয় হয়। গোরার নাট্যরূপ গুরুদেবকে শোনাবার জন্য যখন আমি শান্তিনিকেতনে যাই, তখন তাঁর সঙ্গে আমার 'কঙ্কাল' সম্বন্ধে আলোচনা করি। তিনি আমাকে সিনেমার জন্য কাহিনী তৈরি করতে উৎসাহ দেন।"

রবীন্দ্রনাথ যে অন্ততঃ শশীনাথ ছবিটি দেখেছিলেন ১৯৩৭ সালে, সে-কথা জানিয়েছেন 'সোনার দাগ'-এর লেখক। কানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রীর অভিনয় শশীনাথ ছবিতে, রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ যেখানেই সিনেমার উল্লেখ করেছেন সেখানেই প্রকাশ পেয়েছে অবহেলা এবং কৌতুক, লঘু রসিকতার উপকরণ হয়ে এসেছে সিনেমা। উল্লেখগুলো পর পর লক্ষ্য করা যাক।

তুমি (প্রহাসিনী), ৪ আগস্ট ১৯৪০, শান্তিনিকেতন। প্রুফ নিয়ে আসছেন যে ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোক কী কারণে আসছেন না, রবীন্দ্রনাথ বসে বসে ভাবছেন। সকালে উঠেই কি ভদ্রলোকটি রান্নাঘরের ভাজাভুজিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন, হয়তো গুঁটকি মাছ রান্নাতেই? নাকি ঘুম ভাঙার

পর ঘস্‌ঘস্ করে চামড়া চুলকোচ্ছেন? আর চা খাচ্ছেন? গরমে মাটিতে ঘাম পড়ছে, বাসি কাঁকড়ার চচ্চড়ি পড়ে আছে। অথবা

'সিনেমার তালিকার কাগজে
কে সরাল ছবি' ব'লে রাগো যে।

এই বিড়িটানা শহুরে, যেখানে 'প্রোলিটেরিটের' লক্ষণ এত প্রকট, তার অনুষঙ্গেই এসেছে সিনেমা এবং সিনেমার বিজ্ঞাপন।

এপারে-ওপারে, (নবজাতক) ২০ বৈশাখ ১৩৪৬ (৩মে ১৯৩৯), পুরী। নিঃশব্দ দুপুরে নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ভাবছেন অন্য সব লোকেরা কী করছে? যা-খুশি প্রসঙ্গ নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কণ্ঠস্বরে বকে যাচ্ছে?

'আনন্দবাজার' হতে সংবাদ উচ্ছিষ্ট ঘেঁটে ঘেঁটে
ছুটির মধ্যাহ্নবেলা বিষম বিতর্কে যায় কেটে।
সিনেমা নটীর ছবি নিয়ে দুই দলে
রূপের তুলনা-দ্বন্দ্ব চলে।
উত্তাপ প্রবল হয় শেষে
বন্ধুবিচ্ছেদের কাছে এসে।

প্রগতিসংহার। ১৩৪৮ (১৯৪১)। জোড়াসাঁকো।

যখন শেক্সপীয়রের নাটক সিনেমাতে দেখানো হয়, তখন তাও কি মেয়েরা কোনো পুরুষ অভিভাবকের সঙ্গে গিয়ে দেখে আসতে পারে না? নীহার কড়া হুকুম জারি করলে, তাও না।

প্রত্যেকবারই সুনীতি ভালো কিছু দেখবার থাকলে সিনেমাতে যেত। এখন তার কী হল। এত বড়ো আত্মত্যাগ তো কল্পনা করা যায় না।

ছেলেবেলা। ১৯৪০

ট্রামের পায়দানের উপর ভিড় করে কলেজ আর আপিস ফেরার দল ফুটবল খেলার ময়দানে ছুটত না। ফেরবার সময় তাদের ভিড় জমত না সিনেমাহলের সামনে।...

আমাদের চিৎপুর রোডে আজ আর ওদের (ভোজবাজিওয়ালাদের) ডুগডুগি বাজে না। সিনেমাকে দূর থেকে সেলাম করে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

ল্যাবরেটরি। ১৯৪০

আজ সান্ধ্যভোজ একটা নামজাদা রেস্টোরাঁতে। নিমন্ত্রণকর্তা স্বয়ং

রেবতী ভট্টাচার্য, তাঁর সম্মানিতা পার্শ্ববর্তিনী নীলা। সিনেমায় বিখ্যাত নটী এসেছে গান গাইতে।··· মেয়েরা খুব জোরের সঙ্গে সিগারেট টানছে প্রমাণ করতে যে তারা সম্পূর্ণ মেয়ে নয়।

কোনো উল্লেখেই সিনেমাকে শিল্পকলা বলে মনে হচ্ছে না, বরং সিনেমা আর ফুটবল সগোত্র। বহুদিন আগে, ১৯৩০ সালে, আইজেনস্টাইনের ছবি দুটো দেখার অব্যবহিত পরে, রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার চিঠিতে সিনেমার উল্লেখ করেছিলেন যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে, তবে সেটাও শিল্পকলা হিসেবে ততটা নয়, যতটা প্রচার মাধ্যম হিসেবে। সেবার তিনি বলেছিলেন :

বর্তমান রাশিয়ায় নিষ্ঠুর শাসনের জনশ্রুতি সর্বদাই শোনা যায়—অসম্ভব না হতে পারে। নিষ্ঠুর শাসনের ধারা সেখানে চিরদিন চলে এসেছে, হঠাৎ তিরোভূত না হওয়াই সম্ভব। অথচ সেখানে চিত্রযোগে, সিনেমাযোগে ইতিহাসের ব্যাখ্যায়, সাবেক আমলের নিদারুণ শাসনবিধি ও অত্যাচারকে সোভিয়েট গবর্মেণ্ট অবিরত প্রত্যক্ষ করিয়ে দিচ্ছে। এই গবর্মেণ্ট নিজেও যদি এইরকম নিষ্ঠুর পথ অবলম্বন করে থাকে তবে নিষ্ঠুরাচারের প্রতি এত প্রবল করে ঘৃণা উৎপাদন করে দেওয়াটাকে আর কিছু না লোক অদ্ভুত ভুল বলতে হবে। সিরাজউদ্দৌলা-কর্তৃক কালা-গর্তের নৃশংসতাকে যদি সিনেমা প্রভৃতি দ্বারা সর্বত্র লাঞ্ছিত করা হত তবে তার সঙ্গে সঙ্গেই জালিয়ানওয়ালা-বাগের কাণ্ড করাটা অন্তত মূর্খতা বললে দোষ হত না। কারণ, এক্ষেত্রে বিমুখ অস্ত্র অস্ত্রীকেই লাগবার কথা।

রবীন্দ্রনাথ ডিজিকে একটি পরিচয় পত্র লিখে দিয়েছিলেন ১৯১৪ সালে, যখন ডিজি ইয়োরোপ যাচ্ছেন চলচ্চিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে। ১৯৩০ সালে দিয়েছেন প্রমথেশ বড়ুয়াকে অনুরূপ পরিচয় পত্র। ১৯৩৭ সালে দিয়েছেন 'মুক্তি' ছবির নামটি, 'দিনের শেষে', 'সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে', 'আমি কান পেতে রই', 'তার বিদায় বেলার মালাখানি', গানগুলিও ওই ছবিতে ব্যবহারের অনুমতিও দিয়েছেন। তাঁর পাঁচটি নির্বাক ও চারটি সবাক ছবির অনুমতি দিয়েছেন। আরো দুটি ছবির অনুমতি দিয়েছিলেন, অভিনয়ের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সিনেমা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব তাঁর শেষ পর্যন্তই ছিল। হয়তো তখনকার বাংলা ছবিরই দু-একটি ছবি তিনি দেখেছিলেন, তাঁর নিজের রচনার ছায়াচিত্র ছাড়া। সেসব ছবি চলচ্চিত্র সম্পর্কে উৎসাহী করার মত অবশ্যই ছিল না।

শিল্পভাবনা

কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নয়ন প্রসঙ্গ ঃ সুন্দরবনে বিটশর্করার চাষ

সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
অনুবাদ : নির্মল বসাক

[এ কথা স্বীকার করা ভাল আমাদের শিল্পোন্নয়নের ধারণা মূলত যন্ত্র-শিল্পের উন্নতি প্রয়াসেই নিহিত। স্বাধীনতার ঠিক অব্যবহিত পরেই যে যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন ও শিল্পপ্রসারণের শুরু, সেই নগরকেন্দ্রিক উৎপাদন পরিকল্পনার ধারণা থেকে এখনো আমরা পুরোপুরি মুক্ত হতে পারিনি। সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করে কেবল মুখে রক্ত সঞ্চার হওয়াকে যেমন স্বাস্থ্য বলা চলে না, তেমনি ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ গ্রামের কৃষিভিত্তিক শিল্পসম্ভাবনাকে অবহেলা করে, শুধু কলকারখানার উৎপাদনের ওপর মূলমনস্ক থাকলেও দেশের সার্বিক উন্নতি অসম্ভব। বড় বড় কল-কারখানার উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করেও একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে যেহেতু ভারতের মোট লোকসংখ্যার সিংহ-ভাগই গ্রামের সেহেতু কৃষিউন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জরুরীভিত্তিক কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নয়নের একান্ত জরুরীভিত্তিক প্রয়াস না চালালে ভারতবর্ষের যথার্থ সমৃদ্ধি অসম্ভব।

একথা যেন কেউ না মনে করেন কৃষিভিত্তিক শিল্পউন্নয়ন বলতে আমরা শুধু কৃষি ও কৃষিপণ্যের উৎপাদন বোঝাচ্ছি। ব্যাপক আলোচনা

করলে দেখানো যায় যন্ত্রনির্ভর শিল্পের বহু কাঁচামালের যোগানই কৃষি-শিল্প থেকে আসে। ভেষজশিল্প, বস্ত্রশিল্প, শর্করা-নির্ভর শিল্প সবই কৃষিনির্ভর।

আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গ একটি ঘাটতি অঞ্চল। কৃষিজাতপণ্যে, খনিজদ্রব্যে, বিদ্যুৎ-উৎপাদনে সবকিছুতেই আমরা এখনো স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারিনি। লোকসংখ্যা ছাড়া অন্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ অনেক পেছিয়ে। মানুষের মূল চাহিদার উৎস কৃষি। সেচের উন্নতিতে চাল গমের ফলন বাড়লেও ডাল, তেল, চিনিতে আমরা একান্তই পর-নির্ভর। এখানে প্রকাশিত রচনার প্রতিপাদ্য মূলত চিনি বা শর্করা-নির্ভর। শিল্পে চিনি-শর্করার প্রয়োজনীয়তাকে এখনো আমরা চিনে উঠতে পারিনি। শুধু জিভের স্বাদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের জন্য নয়, সুরাসার অর্থাৎ এ্যালকোহল উৎপাদনের উৎসও ওই গুড়-চিনি-শর্করা। ভেষজ ও নানা অত্যাবশ্যকীয় শিল্প উৎপাদনে এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এ্যালকোহল অপরিহার্য। পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনীয় এ্যালকোহলের প্রায় অধিকাংশই আসে অন্য প্রদেশ থেকে। তাদের করুণানির্ভর হয়েই বেঁচে থাকতে হয় আমাদের। অন্য প্রদেশের যোগানের অসহযোগিতায় একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ভেষজ ও অন্যান্য শিল্পে ১৯৮৫-র অক্টোবর থেকে ১৯৮৬-র মার্চ অবধি ক্ষতি হয়েছে কোটি কোটি টাকা। অথচ সুন্দরবনের ব্যাপক অঞ্চলের নোনা মাটিতে বিট চাষের মাধ্যমে এই সুরাসারের ঘাটতিকে অনায়াসে পূরণ করা যায়। পিছিয়ে থাকা সুন্দরবনকে অনায়াসে করা যায় পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম উন্নত অঞ্চল। বেশ কিছুদিন আগে Administration Training Institute of West Bengal-এর Director শ্রীযুক্ত সুজিত ব্যানার্জী এম. এস ; আই. এ. এস সুন্দরবনের অনুন্নত অঞ্চল ও বিট-শর্করার চাষের ওপর একটি অসাধারণ গবেষণামূলক প্রতিবেদন রচনা করেছিলেন। গবেষণা পত্রটির নাম "Feasibility analysis of a project concept for the development of the coastal-salaine backward region of Sunderbans in West Bengal।" জানি না এই গবেষণাপত্রটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চোখে পড়েছে কিনা। অন্তত সুন্দরবন অঞ্চলে গেলে তার কোনো সুস্পষ্ট চিহ্ন এখনো চোখে পড়ে

না। অথচ যাকে বলে "War footing" ঠিক সে রকমই জরুরী প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই বিট-শর্করা বা চিনি-শর্করার চাষ অবিলম্বে শুরু হওয়া দরকার। শুনেছি শ্রীযুক্ত ব্যানার্জী বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প উন্নয়ন দপ্তরে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। পশ্চিমবঙ্গের পরিচালনায় যারা আছেন তারা তো তাহলে তাঁর সদাপ্রস্তুত সাহায্য নিতে পারেন। কেননা শিল্পের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় এই কাঁচা মালটির জন্য অন্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার বিষময় ফল তো আমরা পেতে শুরু করেছি কোটি কোটি টাকার ক্রমবর্ধমান লোকসানে। এর মূলে কেন্দ্রের কোনো রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে কিনা জানি না। কিন্তু কতকাল আমরা কেন্দ্রের করুণার ওপর নির্ভর করবো। যখন অন্তত এই একটি কাঁচামালের ক্ষেত্রে একটু সচেষ্ট হলেই আমরা আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারি।

শ্রীযুক্ত সুজিত ব্যানার্জীর প্রোজেক্ট গবেষণা (তার অনুমতি নিয়ে) পত্রটির অনুবাদে দুরূহ বৈজ্ঞানিক অংশগুলি আমরা কিছু কিছু বর্জন করেছি পাঠকের সহজ রাসায়নিক ও বোধগম্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে। অনুবাদ করেছেন আরেক বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার কবি নির্মল বসাক। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন প্রসঙ্গে ফরাক্কা ও হলদিয়াকে কেন্দ্র করে তার মৌলিক রচনা ইতিপূর্বে কিভাবে প্রকাশিত হয়ে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল।]

সম্পাদক—বিভাব

এ কথাত সবাই জানেন পশ্চিমবঙ্গ একটি ঘাটতি অঞ্চল। কৃষি পণ্যে হোক, খনিজে হোক, বিদ্যুৎ কল-কারখানায় সবকিছুতেই পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে, বোধহয় একমাত্র লোকসংখ্যা ছাড়া।

এ কথা তো আগেই বলেছি মানুষের মূল চাহিদার প্রধান উৎস কৃষি। চালে গমে শস্যে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে সেচের দৌলতে। কিন্তু ডালে, তেলে, চিনিতে অন্য প্রদেশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা এখনো কিছু করার নেই পশ্চিমবঙ্গের। সাবেক বাংলাতেই চিনির মূল উৎস আখের চাষের অভাব ছিল। চিনি কলের ত' বটেই। সবে ত' তিনটি চিনির কল সাবেক বাংলায়। তার দুটি, চরসিন্দুরের আর দর্শনার দুটি ত' বাংলাদেশের ভাগে। দেশ বিভাগের পরে একটি চিনির কল তৈরি করার চেষ্টা করা হলো বীরভূমের আহমদপুরে কিন্তু তেমন করে দাঁড়ালো না। সে কী আখের চাষের অভাব না পরিচালনার

দোষ, সে আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না। আমরা দেখবার ও দেখাবার চেষ্টা করছি, কী করে অনগ্রসর অঞ্চলকে উন্নত করা যায়, চিনি শর্করার কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে। আমাদের আলোচনার প্রধান জিনিস হচ্ছে :

১. পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর লবণাক্ত সুন্দর বনাঞ্চলকে কীভাবে উন্নত করা যায়।

২. এই অঞ্চলে কীভাবে বছরে দুটো চাষ করে, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা যায়।

৩. কৃষিজাত দ্রব্যকে ব্যবহার করে রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করা, যা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভীষণভাবে দরকার এবং যার থেকে দুর্দশাগ্রস্ত লবণাক্ত কৃষি ভিত্তিক অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতি চাঙ্গা হতে পারে ; সাথে সাথে শিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতিও।

কৃষি-আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়—

১. পাললিক ; ২. পাহাড়ী ও তরাই ; ৩. ল্যাটেরাইট এবং ৪. সমুদ্র তটবর্তী।

পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র তটবর্তী অঞ্চল হল, মেদিনীপুর জেলার কাঁথি এবং ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণাঞ্চল। এর মধ্যে ২৪ পরগণার সুন্দরবনই সমগ্রভাবে লবণাক্ত। সুন্দরবনকে একটু জরিপ করা যাক না! দেখা যাচ্ছে সুন্দরবন আয়তনে ৯,৬২৯ বর্গ কিলোমিটার বিশাল ভূমি। লোকসংখ্যা ২৫ লক্ষের মত। এই অঞ্চলের শতকরা ৪৪ ভাগই বনাঞ্চল এবং এই বনাঞ্চল আবার 'রিজার্ভ' বলে চিহ্নিত। বসবাস যোগ্য জমির পরিমাণ ৪,৪৯৪ বর্গ কিলোমিটার। এই বনাঞ্চলে লোক বসতি আরম্ভ হয়েছে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এই অঞ্চলের বহতাজল একেবারেই লবণাক্ত। স্বাদু জল পাওয়া যায় ৩০০ থেকে ৪০০ মিটার গভীরে—যা উত্তোলন করে ব্যবহার করার পয়সা আমাদের গরীব দেশের নেই। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের দারিদ্র্যতারও বুঝি সীমা পরিসীমা নেই। কাগজের রচনা আর কতটুকুই বা জানাতে পারে। একবার সাদা চোখের এই অঞ্চল ঘুরে এলেই যে কোন লোক বুঝে নিতে পারবেন, এঁদের অবস্থা। এই অঞ্চলে হরিজন ও আদিবাসীদের সংখ্যাও যথেষ্ট পরিমাণ। আর অধিবাসীদের শতকরা ৫০ ভাগের নিজেদের কোন জমি নেই চাষ আবাদ করার। কিন্তু সবাই বলতে গেলে একমাত্র এই জমি আর এই কৃষির উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করছেন। যদিও শতকরা ৮৮·৫ জন এই জমি থেকে গ্রাসাচ্ছাদন

করছেন, কৃষি জমির পরিমাণ যেখানে মাত্র ২·৯৫ লক্ষ হেকটরস্, আর যার মাত্র শতকরা ১ ভাগ সেচের আওতায় এসেছে, তাহলে সে গ্রাসাচ্ছাদন যে কী রকম গ্রাসাচ্ছাদন, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। তার ওপর, এখানকার জমি মাত্র এক ফসলি জমি। জল ও জমিন লবণে ভরা সুন্দরবনের সেজন্য ধান পর্যন্তও খুব ভাল হয় না। জুন থেকে সেপ্টেম্বরে যদিও ভাল বৃষ্টিপাতের ফলে ওপরের জলে লবণের ভাগ কমে, কিছু চাষ হয়, বাকী ন' মাস জমিন প্রায় চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ে লবণের জন্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই, এই অঞ্চলে চাষের নানা দিকের বিকাশের জন্য সুগারবিট (চিনি-শর্করা) চাষের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। চিন্তা হচ্ছেও, কিন্তু তা নির্ভর করে অনেকগুলো জিনিসের ওপর ; সেগুলি নিয়েই বিশদ আলোচনা করার আছে।

প্রথম হচ্ছে, এক-ফসলি জমিকে, দো-ফসলি করার পরিকল্পনা। তাতে অঞ্চলের আয় দ্বিগুণ বাড়ে। কিন্তু তা করতে গেলে জমির লবণের ভাগ কমিয়ে আনা দরকার। সুগার-বিটের চাষ (চিনি-শর্করা) এ ব্যাপারে দারুণভাবে সাহায্য করতে পারে। কারণ সুগার-বিট লবণকে সহ্য করেও তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে এবং তেমন পরিমাণ জলও প্রয়োজন হয় না এর জন্য। এবং এর বাজারে চাহিদা আছে, বিক্রী করে এ অঞ্চলের জনগণ লাভবান হতে পারেন।

এ ব্যাপারে ভারত সরকারের Indian Council of Agricultural Research-এর Dr. P. S. Bhatnagar-এর রিপোর্ট দেখবার মত। তাঁর ওপর ভার ছিল সারা ভারতের সুগার-বিট চাষের (চিনি-শর্করা) প্রজেক্টগুলোর ভার। Prof. D. K. Dasgupta, Dean & faculty of Agriculture & Vaternary Science, Calcutta University। যিনি সুন্দরবনে চিনি শর্করা চাষের অগ্রবর্তী উদ্যোগী ছিলেন, তাঁদের সাথে বর্তমান লেখক অনেক আলোচনা করেছেন, অনেক প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। তাঁদের প্রশ্নোত্তর থেকে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে :

ক) সব ট্রপিক্যাল অঞ্চলে সুগার-বিট গরমের সময় জন্মাতে ও পরিণত হতে ৭।৮ মাস লাগে—সুন্দরবনে শীতের ফসল হিসেবে লাগবে ৫।৬ মাস মাত্র, যা আখ চাষে লাগে সারা বছর।

খ) আমাদের দেশে নতুন হলেও, পৃথিবীর শতকরা ৪৫ ভাগ চিনি তৈরী হয় সুগার-বিট থেকে।

গ) সুগার-বিট যদিও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ফসল, গরম দেশেও এর চাষ হচ্ছে এখন। যেমন, মিশরে, সৌদি আরবে, স্পেনে, আলজেরিয়ায় ও ইরানে।

ঘ) যেহেতু চিনি-শর্করা চাষের সময়, খারিফ শস্য চাষকে পুরোপুরি সময় ছেড়ে দেয়, সেজন্য অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আসে কৃষকদের।

ঙ) তাছাড়া সুগার-বিটের পরিত্যক্ত অংশ, গরু-ছাগলের খাদ্য হিসেবে বেশ চলে, এতে অর্থনীতি আরো চাঙ্গা হয়।

চ) সুগার-বিট যেমন লবণাক্ত জমিতে চাষ করা চলে ভালভাবে, আবার তেমনি এই চাষ জমির লবণাক্ত ভাবকে কমিয়ে দেয়, এমনকি একেবারেই লবণমুক্ত করে। একে "লবণের ঝাড়ুদার" বলা যেতে পারে। চিনি-শর্করা চাষের পরে, সেই জমি ধান চাষের সম্পূর্ণ উপযোগী হয়ে ওঠে। এটি একটি বিরাট লাভ।

ছ) এই চাষের জন্য জল সেচের খুব একটা দরকার নেই। তবে আরো বেশি ভাল ফসল চাইলে, সীমিত জলসেচের ব্যবস্থা থাকলেই চলবে।

ওপরের ব্যাপারগুলো থেকে এটা পরিষ্কার যে সুন্দরবনে ব্যাপকভাবে অর্থ-নৈতিক সাফল্যের সাথে সুগার-বিটের চাষ করা চলে। কিন্তু এর বাজারের ও বাজার দরের অবস্থা কী, সেটা খতিয়ে দেখতে হবে বৈকী! পরবর্তী পর্যায়ে আমরা সেগুলো আলোচনা করছি :

সুগারবিট থেকে ইথানল, সাইট্রিক এ্যাসিড, কারবন-ডাই-অক্সাইড, সোডা এ্যাস এবং অন্যান্য রসায়নের প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

প্রাথমিক কথা হচ্ছে, একটি অপরিচিত শস্যকে বাজার-চলতি করা এবং তার থেকে লাভজনক ভাবে সেই অপ্রথানুগ শস্য উৎপাদন করা। আমার প্রস্তাব হচ্ছে এই সুগার-বিটকে এবং এই সুগার-বিট জাত পদার্থকে শিল্পে ব্যবহার করা। প্রথমেই, এই সুগার-বিট থেকে অতি সহজেই আমরা পেতে পারি ইথানল। পেতে পারি রসায়ন শিল্পে কাজে লাগিয়ে এ্যালকোহল। আবার এ্যালকোহলের রসায়নশিল্পে ব্যবহারের প্রয়োজনীতা যে কতখানি তা যদি ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে সবাই উপলব্ধি করতে পারবেন, এ্যালকোহল, ইথানল তথা বিট চাষের গুরুত্ব কতখানি। এবং সবাই সচেতনভাবে সুগার বিট থেকে ইথানলের প্রস্তুতিকে শুধু সমর্থন করবেন না, ত্বরিত করবেন।

ইথানল এমন একটি রসায়ন, যা সুগার-বিটকে গাঁজিয়ে ও পরিশ্রুত করে পাওয়া যেতে পারে। এই পদ্ধতি অনেক আগেই প্রমাণিত ও স্বীকৃত। ইথানলের

ব্যবহার যোগ্যতাও প্রমাণিত বহু-বহু রসায়ন শিল্পে। ইথানলকে গ্যাসোলিন ব্লেণ্ড হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। ইথানলের তিন রকমের ব্যবহার যোগ্যতা আছে :

ক. সাইট্রিক এ্যাসিড, এ্যাসেটালডেহাইড ইত্যাদি রসায়নের প্রস্তুত করার প্রথম সরবরাহকের ভূমিকা হিসাবে।

খ. ঔষধ ও প্রসাধন জাতীয় জিনিসের মাধ্যমিক রসায়ন হিসাবে।

গ. এ থেকে পানযোগ্য এ্যালকোহল (মদ্য) প্রস্তুত করা যায়।

ঘ. ইদানীং পেট্রলের অভাব চার দিকে, সে হিসেবে, ইথানলের পেট্রলের পরিবর্তে ব্যবহারের যোগ্যতা রয়েছে। দুরকম ভাবে ইথানলকে এ ব্যাপারে ব্যবহার করা যায়।

অ) গ্যাসোলিনের পরিবর্তে সরাসরি ভাবে।

আ) পেট্রলের পরিবর্তে প্রাথমিক রসায়ন হিসাবে।

গ্যাসোলিনের পরিবর্তে ব্যবহারের আগে, ইথানল পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই, রসায়ন শিল্পের প্রাথমিক রসায়ন হিসাবে ব্যবহৃত হতো। সত্যিই, ইথানলের এরূপ গুণ আছে যে একে হয় প্রাথমিক, নয় মধ্যবর্তী রসায়ন হিসাবে প্রায় যে কোন শিল্পেই ব্যবহার করে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করা যায়। এর ব্যবহার শতধারে স্বতঃস্ফূর্ত। বর্তমানের 'পেট্রো-কেমিক্যাল' শিল্পগুলি "ইথাইলিন-নির্ভর।" পেট্রোলকে বিভাজন করে যে 'ন্যাপথা' পাওয়া যায়, তাকে আবার বিশেষ প্রক্রিয়ায় ভেঙে 'ইথাইলিন' পাওয়া যায়। এই পদ্ধতির দ্বারা ইথাইলিন পেতে গেলে, দানবসদৃশ্য কলকারখানা দরকার ; যার জন্য প্রাথমিক ভাবে প্রচুর অর্থব্যয়ও করতে হবে। কিন্তু 'ইথানল' প্রস্তুত করতে সে রকম বড় ত' নয়ই, ছোট কিংবা মাঝারি ধরণের শিল্প গড়ে তুলে, চিনি প্রস্তুতকারক আখ বা চিটেগুড় বা সুগারবিট থেকে 'ইথানল', অনেক কম খরচে প্রস্তুত করা যায়, যা নাকি প্রায় যে কোন রাসায়নিক শিল্পের মূল রসায়ন হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যার সম্বন্ধে আগেই অনেকটা আলোচিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্প প্রকল্পের জন্য প্রধান অসুবিধা হচ্ছে 'ইথানল' তৈরীর জন্য আজো নজর দেওয়া হয়নি, অথচ যে কোন রসায়ন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় এই বস্তুটির উৎপাদন অপরিহার্য। ইথানলের অভাবে রাসায়নিক শিল্প ত' হতেই পারছে না, উপরন্তু আগে যে সমস্ত শিল্প ছিল আমাদের, তাও প্রায় বন্ধ হবার

জোগাড়। বাইরে থেকে ইথানল, এ্যালকোহল আমদানী করতে হচ্ছে। ধরা যাক, ১৯৮১ সনের হিসাব। তাতে দেখা যাচ্ছে, আমরা পশ্চিমবঙ্গের জন্য এ বাবদ ২ কোটি বিদেশীমুদ্রা খরচ করেছি, যার কোন দরকারই ছিল না। কারণ এই বস্তুটি পশ্চিমবঙ্গেই অনায়াসে উৎপন্ন করা যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে, ভারতের অন্যান্য অংশের মতই, এই ইথানল প্রস্তুত করা হয় ঝোলাগুড় থেকে পাতন প্রক্রিয়ায় (dislillation)। আর কে না জানে, এই ঝোলগুড় প্রস্তুত হয় আখ থেকে। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে আখ চাষের এবং কারখানারও অভাব। এই ঝোলাগুড়েরও (molasses) অভাব রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ৫৫,০০০ মেট্রিকটনের মত ঝোলাগুড়ের দরকার বছরে, অথচ আমাদের উৎপাদন বছরে মাত্র ৫,০০০ মেট্রিক টন। রাজ্যে মাত্র দুটিই কারখানা আছে এর। একটি সরকারী পরিচালনায় বীরভূমের আহমদপুরে আর একটি বেসরকারী পরিচালনায় নদীয়ার পলাশীতে। সুতরাং বাকী প্রয়োজনীয় ৫০,০০০ মেট্রিক টন আমদানী করতে হয় ভারতের অন্যপ্রদেশগুলি থেকে বিশেষ করে মহারাষ্ট্র থেকে। তাতে টন প্রতি ঝোলাগুড়ের ক্রয় মূল্য হল ৭২০ টাকা। আর ইথানল প্রস্তুতকরার প্রতিলিটারে ৬·৩২ টাকা। আর এই খরচ, অন্য প্রদেশ থেকে সরাসরি ইথানল কেনার খরচের প্রায় দ্বিগুণ। সুতরাং ঝোলাগুড় আমদানী করে ইথানল প্রস্তুত করা, পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক ভাবে সাফল্য মণ্ডিত হচ্ছে না। অন্যদিকে, সুগার-বিট থেকে যদি ইথানল প্রস্তুত করা যায়, পশ্চিমবঙ্গে সুগার-বিটের চাষ করে, তাহলে প্রাথমিক পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে এখানে ইথানল প্রস্তুত করা লাভজনক হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সুন্দরবনে সুগার বিটের চাষ নিশ্চয়ই লাভজনক প্রস্তাব, যা পশ্চিমবঙ্গের রাসায়নিক ও ঔষধ প্রস্তুত কারখানায় সরবরাহ করা যাবেই শুধু নয়, এই চাষের ওপর ভিত্তি করে আরও রাসায়নিক ও ঔষধ তৈরীর কারখানাও প্রস্তুত করা যেতে পারে। সুগার-বিট থেকে অর্থনৈতিক ভাবে, লাভজনক ভাবে, ইথানল, সাইট্রিক এ্যাসিড এসব তৈরী করা যাবে। এ ভাবেই অনুন্নত সুন্দরবনকে যেমন সুন্দর ভাবে গড়া যাবে, তেমনি রাসায়নিক ও ঔষধের কারখানার নির্মাণও সম্প্রসারণ করে পশ্চিমবঙ্গের চাহিদা যেমন মেটানো যাবে, অর্থনীতিকে যাবে চাঙ্গা করা এবং বেকার সমস্যার সুরাহাও ভালভাবেই করা যেতে পারবে।

॥ কৃষকেরা এই প্রকল্পকে কীভাবে গ্রহণ করবে এবং তাদের অর্থনীতিতেই বা এই চাষ-কতটা প্রভাব বিস্তার করবে ॥

একটা নতুন জিনিসের চাষের প্রস্তাব কৃষকেরা কীভাবে গ্রহণ করবে তা একটা প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এই ব্যাপারটা আলোচনা করতে যেয়ে, আমাদের মনে রাখা দরকার যে বর্তমানে সুন্দরবনের কৃষকেরা তাদের জমি থেকে এক-ফসলা ধান থেকে আর কিছুই পায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি 'চিনি-বিট' চাষের প্রস্তাব দেওয়া যায়, সাথে সাথে তাদের এই সাহস জুগিয়ে যে চাষের প্রণালী তাদের শিখিয়ে দেওয়া হবে, বিনা খরচে চাষের সমস্ত বীজ বা চারা জোগান দেওয়া হবে, সাজ-সরঞ্জাম যা দরকার তাও দেওয়া হবে, সর্বোপরি উৎপাদিত ফসল ভাল দামে তাদের কাছ থেকে কিনে নেওয়া হবে—তাহলে গরীব চাষীরা রাজী হবেই বা না কেন! উপরন্তু, বিটের যখন চাষীরা জানবে, বিটের ওপরের অংশ, যা থেকে ঝোলাগুড় বা ইথানল উৎপন্ন করা যায় না, তা তারা এমনিই পারে গোরু, মোষ, ছাগলের ও অন্যান্য গৃহপালিত জন্তুর খাদ্য হিসেবে। তখন এই অভাবের দেশের চাষীরা খুশীতে ডগমগ হয়েই উঠবে। নীচে, এই চিনি-বিট চাষের একটা অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে তুলে ধরছি. যা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে এই চাষ সুন্দরবনের চাষীকে উদ্বুদ্ধ করবেই।

এই ব্যাপারে একটা উদাহরণ খাড়া করছি : অধ্যাপক ডি. কে. দাশগুপ্ত এবং তাঁর সহকারীগণ একটি সমীক্ষা করেছেন, তাতে দেখা গেছে, ২০০,০০০ হেক্টর অর্থাৎ প্রায় ৫ লক্ষ একর জমি বিট চাষের জন্য পাওয়া যাবে এই সুন্দরবনে। প্রতি একর জমি চাষ করার খরচ ১৪০০ টাকার মত। অর্থাৎ ৫ লক্ষ একর জমির জন্য ৭০ কোটি টাকা। প্রতি একরে ১৪ টন চিনি বিট পাওয়া যাবে। ৭ টন চিনি বিট থেকে ১ টন চিনি পাওয়া যায়। যা থেকে পাতন প্রক্রিয়ায় ৬৪০ লিটার ইথানল পাওয়া যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রতি একর জমি থেকে ৬৪০×২ =১২৮০ লিটার ইথানল পাওয়া সম্ভব। সুতরাং ৫ লক্ষ একর জমির চাষ থেকে ৬৪ কোটি লিটার ইথানল প্রস্তুত করা যেতে পারে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের দরকার মাত্র ৫ কোটি লিটারের। কলকাতার বাজারে, ১ লিটার ইথানলের দাম এখন মোটামুটি ৩·০০ টাকা। এই দামকে সঠিক ধরে, ৫ লক্ষ একর জমি থেকে প্রাপ্ত ইথানলের বাজার মূল্য হল ১৯২ কোটি টাকা, যেখানে ঐ জমিতে চিনিবিট চাষ বাবদ মোটামুটি খরচ হল মাত্র ৭০ কোটি টাকা।

এখনকার বাজারে, চিনিবিটের প্রতি টনের মূল্য হল ১৫০ টাকা। আর এক

একর চাষ করলে উৎপাদনের আনুমানিক পরিমাণ হল ১৪ টন ; তাহলে চাষী প্রতি একর জমি চাষ করে পেতে পারে ১৫০×১৪=২১০০ টাকা। এখন সমস্ত জমির হিসাব করলে দাঁড়ায়, ৫ লক্ষ একর জমির চিনিবিটের মূল্য ১০৫ কোটি টাকা। এই পর্যালোচনাকে যদি নীচের মত করে সাজাই, তবে মূল ব্যাপারটা এক নজরে ধরা পড়বে, যা বেশ লাভজনক হবে বলে আপনাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে :

বিক্রয়লব্ধ আয় (টাকা)	উৎপাদন ব্যয় (টাকা)
১। ইথানল বিক্রী থেকে— ১৯২ কোটি	১। চিনিবিট ক্রয়ের দাম— ১০৫ কোটি
২। কার্বন-ডাই-	২। বিট থেকে ইথানল
অক্সাইড থেকে— ৭৫ ,,	প্রস্তুত খরচ— ৯২ ,,
৩। আবর্জনা থেকে পশুখাদ্য	৩। যাতায়াত, গোদামজাত
বিক্রীর আয়— ধরা হয়নি	করার খরচ— ধরা হয়নি
২৬৭ কোটি	১৯৭ কোটি

ওপরের তালিকা থেকে এইই মনে হচ্ছে যে চিনিবিট চাষ করে, ইথানল উৎপাদন করে লাভ হবেই। চাষীরা ত' দারুণভাবে উপকৃত হবে। দেশের চাহিদা মিটবেই শুধু নয়, রপ্তানিও করা যাবে। এ গেল চিনিবিট থেকে যদি শুধু ইথানল প্রস্তুত করা হয়, তার কথা। যদি চিনিবিটের শতকরা ৪০ ভাগ থেকে সাইট্রিক অ্যাসিড (Citric Acid) উৎপন্ন করা হয়, যার চাহিদা আমাদের দেশে প্রচুর, তাহলে বিক্রয়লব্ধ আয় বেশ ভালভাবেই বাড়তে পারে। এক কেজি সাইট্রিক অ্যাসিডের দাম যেখানে ৩০ টাকা, এক লিটার ইথানলের মূল্য সেখানে মাত্র ৩ টাকা। আর দেশের সাইট্রিক অ্যাসিডের চাহিদা যেখানে ৭০০০—৮০০০ মেট্রিক টন, উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র ৩০০০—৪০০০ মেট্রিক টন। এ থেকে যে কোন লোক উপলব্ধি করতে পারবেন যে সাইট্রিক অ্যাসিডের বাজার কীরকম ভাল ! এবং প্রস্তুত হওয়া মাত্রই যে তা বিক্রী হয়ে যাবে, সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ কত তাড়াতাড়িই না আবার বিনিয়োগ করা যাবে ! আরো গভীরভাবে এ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করলে, লাভের পরিমাণের হিসাব আরও সূক্ষ্মভাবে পাওয়া যাবে সত্যি, কিন্তু ওপরের আলোচনা থেকে এটি ঠিক বোঝা যাচ্ছে যে চিনিবিটের চাষ, তা থেকে ইথানল এবং সাইট্রিক অ্যাসিডের উৎপাদন, পশ্চিমবঙ্গের চাষী থেকে শুরু করে, কল-কারখানার শ্রমিক এবং ব্যবসায়িদের এক লাভজনক দিগন্ত দেখাবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

॥ খামার থেকে কারখানা পর্যন্ত যোগাযোগ রক্ষা ব্যবস্থা ॥

এই ব্যবস্থা যতই সুপরিচালিত হবে—ততই লাভবান হয়ে উঠবে কৃষক, কারখানার শ্রমিক, অন্যান্য ব্যবসায়ীরা, জনপদবাসী এবং সর্বোপরি সরকার। সরকারকে কখনো গরীব মানুষের জন্য 'ভর্তুকী' দিতে হবে না, কারণ এই অঞ্চলের মানুষের আয় আর দারিদ্র্যসীমার নীচে পড়ে থাকবে না। তারা ক্রমশই হয়ে উঠবে স্ব-নির্ভর, কৃষিনির্ভর ও শ্রমনির্ভর। তাদের পেটের ভাত তাদের নিজের মুঠিতে, এই ব্যবস্থা সচল হলেই, আপনা আপনি উঠে আসবে। সুতরাং এই ব্যবস্থাপনাকে সচল রাখতে হবে সর্বদাই, কতকগুলো কাজের ওপর যা নির্ভরশীল, সেই কাজগুলোর চলার পথ নির্দেশ করা হয়েছে।

এটা ধরেই নেয়া যেতে পারে, আমাদের দেশের কৃষকেরা তাদের ছোট ছোট জমিতে চাষ করবে চিনিবিটের, কিন্তু তাদের একটা কাজ করতে হবে, তাহল তাদের একটা 'কোয়াপারেটিভ' গঠন করতে হবে—যার মাধ্যমে তারা পাবে ধার, যা দিয়ে তারা চাষ করতে পারবে নিশ্চিন্তমনে। প্রদেশ সরকারের কাছ থেকে তারা পাবে নতুন ধরণের চাষের পদ্ধতিগত বিদ্যা। সরকার নিযুক্ত বিভিন্ন সংস্থা কিনে নেবে সব কাঁচামাল, চাষীদের কোয়াপারেটিভ থেকে অথবা সরাসরি চাষীদের কাছ থেকে এবং চালান করবে গুদামে। গুদাম থেকে কাঁচামাল যাবে কারখানায়। কারখানা তৈরী করবে ইথানল, কার্বন-ডাই-অক্সাইড—তা থেকে সোডা এ্যাস, এমন কী সাইট্রিক অ্যাসিড পর্যন্ত। এইসব রাসায়নিক পদার্থের বিক্রীত অর্থে চাষীকে জোগানো যাবে টাকা—যা দিয়ে তারা আবার নতুন উৎসাহে চাষ করবে এই চিনিবিটের। এই চক্রমণেই চলবে জনপদের উন্নতি। এই যে চাষীর ক্ষেত থেকে শিল্পজগৎ পর্যন্ত বিস্তার—এই হচ্ছে এই প্রকল্পের সার কথা, যার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাই হচ্ছে উন্নতির প্রধান সোপান, প্রাচুর্যের প্রধান তোরণদ্বার।

॥ এই প্রকল্পের উপকারের দিকগুলো ॥

যতটা আলোচনা করা হয়েছে এখন পর্যন্ত, তাতে দেখা যায় যে সুন্দরবনের ৫ লক্ষ একর লোনা জমিতে ৩ থেকে ৫ বছর ব্যাপী চাষ থেকে এই অঞ্চল লাভ করতে পারবে অর্থ নৈতিক স্ব-নির্ভরতা এবং একই সাথে প্রদেশের রসায়ন শিল্পকে এগিয়ে দিতে পারবে আগামী শতাব্দীর দিকে।

এখানে শিল্পের কথা আরও একটু বলা দরকার বলে মনে করি। আমাদের মনে রাখতে হবে, 'ইথানল', সেইসব রসায়নের মূল সূচনার ব্যাপার যা 'ন্যাপথা'-

জাত, যা আবার তৈরী হয় পেট্রোলিয়ামকে বিভাজন করে। আমাদের ত' পেট্রোলিয়ামের খুব অভাব, সেক্ষেত্রে আমরা ইথানল থেকে পেট্রোলিয়ামের বিকল্পও তৈরী করে ফেলতে পারি। আর তা যদি পারি, তাহলে প্রাদেশিক সরকার থেকে কেন্দ্রিয় সরকার আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাবে।

এখন দেখা যাক, সুন্দরবন এ বিষয়ে আমাদের কতটা সহায়তা করতে পারবে বা আমরাই তাকে কতটা স্ব-নির্ভর করতে পারব। ধরুন, সুন্দরবনের পাঁচ লক্ষ একর জলাজোলা ভূমিকে আমরা চিনিবিট চাষের আওতায় নিয়ে এসেছি—তাহলে কী উপকার হবে সুন্দরবনের :

ক. ২,০০০,০০০ শ্রম দিবসের কাজ আমরা দিতে পারব। অর্থাৎ ২ লক্ষ লোক ২ মাস অর্থাৎ ৬০ দিন—যখন তাদের অন্য কোন কাজ করার থাকবে না ক্ষেতে বা অন্য কোথাও—এখানে খাটতে পারবে সরাসরি টাকার বিনিময়ে অথবা ফসল উঠলে তা বিক্রী করে আরো লাভবান হবে।

খ. নেট মুনাফা হবে এই ৫ লক্ষ একর জমি থেকে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা, সব খরচ-খরচা বাদে—তা আবার এই অঞ্চলের কাজেই লাগানো যাবে।

গ. চিনিবিট চাষের আর একটা সুবিধা হল এই, একই জমিতে কিছুদিন চাষ করলে, জমি লবণাক্ত ভাব কমে যায়, এমনকী একদমই থাকে না। তখন এই জমিতে আরো লাভযোগ্য ধানের চাষ করা যাবে, তাতে যেমন অর্থ নৈতিকভাবে লাভবান হবে জনপদবাসী, বেকারত্বও যাবে তেমনি কমে। কারণ, আবার কিছু লোনা জমি, বিট চাষের আওতায় আনা হবে।

ঘ. সুগারবিট থেকে পাওয়া পরিত্যক্ত অংশ গবাদি পশুদের খাদ্য জোগান দেবে। অতিরিক্ত ফসল হলেও গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে, তাও ব্যবহার করা যাবে—গরীব চাষীদের পক্ষে এও কম সুবিধার কথা নয়।

ঙ. আবার ওদিকে সুগারবিট থেকে চিনি-শর্করা তৈরী হয়ে চার রকমের কারখানার উদ্ভব হতে সহায়তা করবে— ১. ইথানল তৈরীর কারখানা হবে, ২. সাইট্রিক এ্যাসিড তৈরী করতে হবে দ্বিতীয় কারখানায়, ৩. আর একটিতে হবে সোডা এ্যাস (কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে) আর ৪. চতুর্থটিতে তৈরী হবে ঔষধ ও নানা রকম প্রসাধনী ও রাসায়নিক শিল্পসামগ্রী। আর এসবই করতে হবে সরকারী পরিচালনাধীন। এই সমস্ত রসায়ন শুধু দেশের চাহিদাই মেটাবে না, বিদেশেও রপ্তানী করা যাবে, যাতে এই অঞ্চলের অর্থনীতিই শুধু চাঙ্গাই হবে না, সমগ্র পূর্বাঞ্চলেরই উন্নতি হবে।

এখন দেখা যাক, এই প্রকল্পের পরিচালনার দিকটি কীভাবে সুষ্ঠুভাবে করা যেতে পারে। এই যে বিশাল কর্মযজ্ঞ, যা সুষ্ঠুভাবে করতে হলে, প্রথমেই দরকার হবে ক্ষেতে খামারেও যেমন, তেমনই কলকারখানাতেও অর্থ যোগান দেওয়া অর্থাৎ ধার দেওয়া। তারপরে কতকগুলো কথা আসে, যেমন :

ক) এ বিষয়ে জ্ঞান।

খ) বিশেষজ্ঞের পরামর্শ। এবং

গ) অভিজ্ঞতা অর্জন।

এবং এই সবকিছুর সমন্বয়ের জন্য ওপরের বিষয়গুলোকে এই প্রকল্পের মধ্যে এমন ভাবে রান করতে হবে যে যেন সমগ্র প্রকল্পটিই হয়ে ওঠে একটা শিল্প ; যে শিল্পের মূলে থাকতে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং ক্রমেই এখান থেকেই জন্ম নিতে পারবে বিশেষজ্ঞরা—যাঁরা এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে সুষ্ঠুভাবে যোগ করে দিতে পারবেন এই আশার প্রকল্পটিকে। এরই জন্য চিন্তা করা হয়েছে কতকগুলো পরামর্শ, যার পর্যালোচনা করা হচ্ছে পরবর্তী পর্যায়গুলোতে :

প্রথাগত নয়, এমন শস্য প্রথমে উৎপাদন করতে গেলে অনেক বাধা আসতে পারে, সেই ভেবে চিনিবিট চাষের জন্য এবং তাকে বাজার জাত করা ও কলকারখানা থেকে তা দিয়ে আকাঙ্ক্ষিত উৎপাদন বের করা এবং তাকে আবার বাজারে চালু করে লাভজনক ব্যবসার জন্য একটি স্বয়ং-শাসিত কোয়াপারেটিভ সংস্থার দরকার হবে সরকারের বলে বোধহয় আমাদের। কারণ, সরকারী সংস্থার মধ্যে যে কৃষি বিভাগ রয়েছে, তারা কেবল প্রচলিত শস্য উৎপাদন নিয়েই কারবার করেন, সেই ফসল থেকে উৎপাদিত কোন সামগ্রীকে বাজার জাত করার অভিজ্ঞতা এঁদের নেই। সেইজন্য সুন্দরবনে অনতিবিলম্বে চিনিবিট চাষের জন্য একটি কোয়াপারেটিভ সংস্থা গঠন করা প্রথমেই অত্যন্ত আবশ্যক। আমরা এ ব্যাপারে নয়াদিল্লীতে কথাবার্তা বলেছি, তাতে ন্যাশনাল কোয়াপারেটিভ ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন (N. C. D. C.) বলেছেন—কোন কোয়াপারেটিভের মাধ্যমে চাষীরা এলেই, তাঁরা চাষের জন্য টাকা ধার দিতে পারবেন। নইলে তাদের পক্ষে একক কোন চাষীকে ধার দেয়া সম্ভব নয়। এখন, আমরা কোয়াপারেটিভের মাধ্যমে অগ্রসর হতে পারলে, চিনিবিট চাষের জন্য টাকার জোগান অসম্ভব হবে না বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই কোয়াপারেটিভ সংস্থাগুলো যেমন টাকা ধার দেবে, তেমনই ফসল সংগ্রহ করে কারখানায় পাঠিয়ে তাদের টাকা উসুল-আমদানীও করবে। বর্তমানের কথা

ধরলে, পূর্বাঞ্চলের একটি সংস্থার নামকরা যারা-যাদের এই ধরণের কাজের অভিজ্ঞতা আছে—তাঁরা হলেন মেসার্স ইস্টার্ণ ডিস্টিলারিস—একটি সরকারী সংস্থা। এঁদের একটি উপদেষ্টামণ্ডলী আছে, যাদের মধ্যে অভিজ্ঞ, কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরা আছেন। আরো তাঁদের আছে শস্য থেকে কারখানা-জাত সামগ্রী বাজারজাত করার প্রচুর অভিজ্ঞতা। সত্যিকথা বলতে কী, বর্তমানে যে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে সেই বিষয়টি সম্বন্ধে প্রস্তাব করেছে মেসার্স ইস্টার্ণ ডিস্টিলারিস। সুতরাং এই সংস্থার ওপরেই ন্যস্ত করা যেতে পারে চিনি-শর্করা প্রকল্পের ভার, তবে ২।১টি বিদেশী সংস্থার সাথেও ভাগে যোগে (collaboralion) কাজ করতে হবে। যেমন,

ক. চাষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত ও জ্ঞানের আমদানী।

খ. শিল্পবিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত ও জ্ঞানের আমদানী।

'ক' বিষয়ে ইস্টার্ণ ডিস্টিলারিস প্রথম জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞের মতামত এনে, তা কোয়াপারেটিভকে দেবে এবং কোয়াপারেটিভ তা চাষীদের মধ্যে সরাসরি বিতরণ করতে পারবে।

'খ' বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে ইস্টার্ণ ডিস্টিলারিস নিজেই রসায়নের উৎপাদন শুরু করবেন প্ল্যান্ট বসিয়ে, এবং ১ বছর বাদে তা কোয়াপারেটিভের কাছে হস্তান্তর করবেন। ইস্টার্ণ ডিস্টিলারিসের মত একটি সংস্থা যদি এইভাবে মূল জিনিসটি পরিচালনা করেন, তা হলে ভবিষ্যতে কোয়াপারেটিভ এই সংস্থাকে চাষীর ক্ষেত থেকে বাজার পর্যন্ত চালাতে পারবেন, তাতে কোন বেগ পেতে হবেনা বলেই আমাদের মনে হয়। এমন কী, এই কোয়াপারেটিভের চ্যায়ারম্যানকে ইস্টার্ণ ডিস্টিলারিস-এর বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স এর মধ্যেও নেয়া যেতে পারে। তাহলে এই চিনি-শর্করা প্রকল্প আরো ভালভাবে পরিচালনার আশা করা যায়। ইস্টার্ণ ডিস্টিলারিসের বোর্ড অব ডাইরেক্টররা যেমন আছেন, তেমনি তাঁরা কাজ চালিয়ে যাবেন, তার ওপর সরকার নিয়োজিত একজন চ্যায়ারম্যান নিযুক্ত হতে পারবেন, যার একটি বিশেষ কমিটি থাকবে যাদের মাধ্যমে চ্যায়ারমান চিনি-শর্করা প্রজেক্টকে পরিচালনা করবেন।

আর এরকমভাবেও প্রকল্পটি পরিচালনা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সরকারকে একটি নতুন কোম্পানী খুলতে হবে। হয় সবটা সরকারী সংস্থা হিসাবে, নয় আংশিকভাবে অন্তত এবং তাঁদের দায়িত্ব নিতে হবে চিনিমিটি থেকে রাসায়নিক পদার্থগুলো তৈরী করার ও সেগুলোকে বাজারজাত করার। এভাবে করলে একটা

অসুবিধা হবে। কারিগরি জ্ঞান অর্জন ও কারখানা স্থাপন করতে করতে সময় লেগে যাবে প্রচুর এবং সরকারী পুঁজি আটকে যাবে অচিরাৎ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ইস্টার্ণ ডিস্টিলারিসকে যদি কাজে লাগানো যায়, চিনিশর্করা প্রজেক্টের জন্য একটি বিশেষ কমিটি স্থির করে তাঁদের পরিচালনায় সামগ্রিক ভাবে সংস্থাটিকে চালনা করে, পরে কোয়াপারেটিভের হাতে এর পরিচালনাকে হস্তান্তর করে, তাহলে ব্যাপারটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাই। ততোদিন যোগ্যতার দিক থেকে কোয়াপারেটিভও তৈরী হয়ে যাবে। কারণ, ইস্টার্ণ ডিস্টিলারিসের পরিচালনাধীন স্পেশাল কমিটির কেউ হবেন কোয়াপারেটিভের প্রধান পরিচালক।

উপসংহারে, একটু বলতে চাই যে যদিও এটি আমার কাজ নয়, তবু আমি নিজে থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রকল্পটি তৈরী করেছি এই ভেবে যে আমাদের গরীব দেশে একটা কিছু করা উচিত, যার সহজেই রূপ দেওয়া যেতে পারে এবং যার থেকে বহুলোক কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়িক সংস্থায় নিযুক্ত হয়ে উপকৃত হতে পারেন। আমি এই প্রকল্পটি তৈরী করেছি এবং ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি—যাতে প্রতীয়মান হচ্ছে, কৃষিকে আমি যুক্ত করার চেষ্টা করেছি শিল্পের দৃঢ় ভিত্তির ওপর। আর সেই শিল্প সামগ্রী যা তৈরী হবে কলে-কারখানায় তার চাহিদা আছে দেশে ও বিদেশে। এবং কৃষিক্ষেত্রে যে সময়ে এর কাঁচামাল উৎপাদন হবে, তা অর্থনীতিকে দিতে পারবে বর্তমান থেকে অধিক কিছু। সুতরাং এই প্রকল্প যে দৃঢ় পায়ের ওপর দাঁড়াবে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তবু আর কোন বিশেষজ্ঞ দিতে পারেন এ বিষয়ে আরো কিছু সুলুক সন্ধান, তারপর অনায়াসে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে এ প্রকল্পে সরকার ও সমবায়ের মারফৎ। তাহলে, অতি মুনাফা খোরদের হাত থেকে রেহাই পাবে চাষী, মজদুর, অন্যান্য কর্মচারী এবং ছোট ব্যবসায়ীবৃন্দ।

সুতরাং আমরা আহ্বান করছি, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জনগণের স্বার্থে, জনগণের অর্থে জনগণের এই প্রকল্পকে রূপায়িত করতে, সে রূপায়ণ শুধু সুন্দরবনেই থেমে থাকবে না। বিস্তার লাভ করবে সারা পশ্চিমবঙ্গে তথা পূর্ব ভারতের আনাচে-কানাচে আর সমৃদ্ধ করবে সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থা, সমৃদ্ধ করবে সমগ্র অঞ্চল তথা দেশকে।

মূল গবেষণাভিত্তিক রচনা অবলম্বনে

অনুবাদ : নির্মল বসাক

আলোচনা

চাকুরীর একাল সেকাল

লাভলীমোহন রায়চৌধুরী

চাকরি নিয়ে হাহাকার এ যুগের এক সাধারণ অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশ আজ এমন পরিবার সত্যিই বিরল যেখানে দু-একটা বেকার পাওয়া যাবে না। যাঁরা চাকরি করেন দেশের বেশির ভাগ শিক্ষিত বেকার যুবক তাঁদের মনে মনে ঈর্ষা করেন। এক হিসেবে তাঁরা সত্যিই ভাগ্যবান—কয়েকটা বছর আগে জন্ম নেওয়ার দৌলতে তবুও কিছু করে খাচ্ছেন, নইলে এ যুগে জন্মালে স্রেফ বি. এ, এম. এ পাশ করে কারও পক্ষে কিছু জুটিয়ে নেওয়া যথার্থই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু এহেন ভাগ্যবান সরকারী চাকুরেরাও যে খুব সুখে আছেন সে কথা বলা চলে না। দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে যাহোক কোনরকম একটা সামঞ্জস্য রেখে তাঁদেরও যে মাইনে বাড়া উচিত এ কথা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু সরকারের ভাঁড়ার সংকীর্ণ। এক আধটা পে কমিশন বসিয়ে বহু দিন পরে যদিও বা কিছু আদায় করা যায় কিন্তু ততদিনে মুদ্রাস্ফীতির দাপটে অবস্থা আবারো সেই সেই পুরোণ চেহারা ফিরে পায়। ফলে ডি. এ.-র কিস্তি কিংবা গ্রেড রিভিসনের জন্য নোতুন করে আবার আন্দোলন শুরু হয়।

অনেকে মনে করেন যে চাকরিজীবীদের এই বিড়ম্বনা নিতান্ত হালের ঘটনা। কিন্তু ইতিহাস অন্য সাক্ষ্য দেয়। বস্তুতঃ চাকরি নিয়ে আশা-নিরাশার এই তাড়না বাঙালী তথা ভারতবাসীকে কোম্পানীর আমল থেকেই সয়ে আসতে হয়েছিল। আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে লর্ড কর্ণওয়ালিশ এ দেশের জন্য যে নোতুন শাসন রীতি প্রচলন করে গিয়েছিলেন তাতেই চাকরিজীবী হিসেবে ভারতবাসীর

ভাগ্য একটা নিম্নতম সীমার মধ্যে বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কর্ণওয়ালিশের মতে সাধারণ ভারতীয়ের চরিত্রে সততা বা সাধুতার স্পর্শ মাত্র ছিল না। ইংরাজের চাকরি করতে এসে ভারতীয়েরা কোম্পানীকে কিভাবে ফাঁকি দিয়ে চলেছেন সেই চিন্তাই কর্ণওয়ালিশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ফলে তাঁর আমলে উঁচু মাইনের কোভেনেন্টেড চাকরিগুলো কেবল সাগরপারের সাহেবদের জন্যই রিজার্ভ করে রাখা হত। আর দেশের মানুষ গরীব নেটিভদের জন্য বাঁধা ছিল শুধু কম মাইনের শ্রমসাধ্য চাকরিগুলো।

এইসব হতভাগা নেটিভরা কি রকম মাইনে পেতেন তার একটা হিসেব দিয়ে ১৮৪৮ সালে 'ক্যালকাটা রিভিউ' কাগজে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছিল। এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত তালিকাটিতে সময়ের কোন হিসাব দেওয়া নেই, তবু এখানে সেটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

চাকরিজীবীর মোট সংখ্যা	বেতনের মোট পরিমাণ (মাসিক)
২৩,১১৮	২ টাকা থেকে ৪ টাকা পর্যন্ত
১১,৪১৭	সাড়ে ৪ „ ৮ „ „
৩,৫০৪	৮ „ ১২ „ „
১,৭০৭	সাড়ে ১২ „ ১৬ „ „
১,১৬৩	সাড়ে ১৬ „ ২০ „ „
৩৫৭	৯১ „ ১০০ „ „
৫৪	২০১ „ ৩০০ „ „
৩৯	৩১০ „ ৩৫০ „ „

উপরোক্ত তালিকার বাইরে ৩২ জন লোক মাথাপিছু মাসিক ৪০০ টাকা এবং মাত্র ১ জন করে মাথাপিছু মাসিক ৫০০, ৭৫০ এবং ১২০০ টাকা বেতন পেতেন। দেশের প্রায় ৭৪২ জন লোক মাত্র ২ টাকার মাস মাইনেয় নিযুক্ত ছিলেন এবং গ্রামাঞ্চলের প্রায় পৌনে ২ লাখ চৌকিদারের জন্য গড়ে মাসিক ৩ টাকার বেশি মাইনে বরাদ্দ ছিল না।

বুদ্ধিজীবী বলে বাংলাদেশে যাঁরা সবিশেষ পরিচিত ছিলেন হিন্দু কলেজের সেইরকম ডাক সাইটে ছাত্ররা ইংরাজ সরকারের চাকরিতে কি রকম শোচনীয় রকম কম মাইনেয় জীবন কাটিয়ে দিতেন তার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এই কলেজের একেবারে গোড়ার দিকের ছাত্র তারাচাঁদ চক্রবর্তী স্থনামের সঙ্গে ছাত্রজীবন পার হয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়ে হুগলির

মুন্সেফ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু এই চাকরির মাইনে এতই কম যে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই তাঁকে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তবুও তো সেকালের নিরিখে মুন্সেফের চাকরি একটা লোভনীয় পদ বলেই গণ্য হত। সেই চাকরিতেই যখন এই অবস্থা তখন সাধারণ শিক্ষক এবং কেরাণীর চাকরিতে ক'টাকা পাওয়া যেত তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। আসলে ১৮২১ সাল পর্যন্ত মুন্সেফদেরও আলাদা করে কোন মাস মাইনে দেওয়া হত না। আদালতে রুজু করা মামলার স্ট্যাম্প ডিউটি থেকে তাঁরা পারিশ্রমিক বাবদ মাত্র কিছু অংশ লাভ করতেন। কোম্পানীর সরকার ভাবতেন যে, যেহেতু ভারতীয়েরা স্বভাবতই মামলাবাজ, সেই কারণে স্ট্যাম্প ডিউটি থেকে পারসেন্টেজের হিসেব পেলে, মুন্সেফদের একেবারে মন্দ আয় হবে না। বাড়তি পারসেন্টেজ পাওয়ার লোভে এই সব মুন্সেফরাই মক্কেলদের অকারণে মামলা-মোকদ্দমা করতে উৎসাহ দিতেন এই ছিল কর্তৃপক্ষের ধারণা। বস্তুত তাঁরা মুন্সেফকুলের সততা সম্পর্কে এতই সন্দিহান ছিলেন যে ১৮০৬ থেকে ১৮১৪ সালের মধ্যে বেশ কয়েকজন ইংরাজ জেলা জজ, মুন্সেফ পদটি তুলে দেওয়ার জন্যও সরকারের কাছে আবেদন করেন। মুন্সেফদের মত বিচার কাজে নিযুক্ত সদর আমীন নামক ভারতীয় অফিসারদেরও একই রকম শোচনীয় অবস্থা ছিল—১৮২৪ সালের পূর্ববধি তাঁদেরও চাকরিতে কোন নির্দিষ্ট মাস মাইনে দেওয়া হত না।

কোম্পানীর শাসনের গোড়ার দিকে ভারতীয়দের মধ্যে মুন্সেফরাই ছিলেন সবচেয়ে পদস্থ সরকারী কর্মচারী। পরবর্তীকালে রাজস্ব ও প্রশাসন বিভাগের জন্য মুন্সেফদের সমান্তরাল আরো দুটো গুরুত্বপূর্ণ রাজপদের সৃষ্টি করা হয়। ১৮৩৩ সালের ৯নং রেগুলেশন অনুযায়ী ডেপুটি কালেক্টর এবং এর নয় বছর পরে ১৮৪৩ সালের ১৫নং এ্যাক্ট অনুসারে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-পদ দুটো সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই সব ব্যবস্থার ফলে দেশ তথা কোম্পানীর ভারতীয় সাম্রাজ্যে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে কি রকম পরিবর্তন এসেছিল, সরকারী রিপোর্টগুলোতে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। এই রকম একটা রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১৮৪৯ সালে উচ্চপদস্থ সরকারী চাকরিগুলোতে মোট ৬৪ জন প্রিন্সিপ্যাল সদর আমীন, ৮১ জন সদর আমীন, ৪৯৪ জন মুন্সেফ, ১১ জন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ৮৬ জন ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে যাঁদের মাইনে সবচেয়ে বেশি সেই প্রথম শ্রেণীর বিচারকের ক্ষমতা সম্পন্ন প্রিন্সিপ্যাল সদর আমীনগণ মাসিক সর্বোচ্চ ৬০০ টাকা বেতন পেতেন। মুন্সেফরা গড়ে মাথাপিছু ১৫০ টাকা পেতেন, আর

ডেপুটি কালেক্টরদের মাইনে মাথাপিছু ৩০০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যেই বাঁধা থাকত। লর্ড ডালহাউসি মাসিক ৫০০ টাকা মাইনের একটা সিনিয়র মুন্সেফ পদ সৃষ্টি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ আপত্তি জানানোয় ১৮৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় নি।

১৮৬৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে সারভিনেট এক্সিকিউটিভ সার্ভিসের ভারতীয় অফিসারগণ তাঁদের মাইনে বৃদ্ধির দাবীতে সরকারের কাছে একটি আবেদন পেশ করেন। এই আবেদন পত্রে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরা কত কম টাকা পান সে কথা উল্লেখ করে মহামান্য সরকার বাহাদুরকে তাঁদের মাইনে যৎকিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। আবেদনকারীরা বলেন যে, একজন ডেপুটির মাইনে কমপক্ষে মাসিক ৪০০ টাকায় ধার্য করা উচিত এবং সমস্ত রকম বিভাগীয় পরীক্ষায় পাশ করার পর, কর্মজীবনের শেষে তাঁরা অন্তত ১০০০ টাকা বেতন পাওয়ার প্রত্যাশা করেন। ডেপুটিদের এই দাবী পত্রের ভিত্তিতে সরকারের তরফে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায় নি। অনুমান করা যায় যে আবেদন পত্রে যে বেতনক্রমের দাবী করা হয়েছিল বাস্তবে ডেপুটিরা তার থেকে অনেক কম টাকা মাইনে পেতেন।

আবেদন পত্রে উল্লিখিত দাবীর বহর দেখে আজকের যুগের সরকারী কর্মচারীদের কিন্তু ভিরমি লেগে যেতে পারে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের প্রায় এক যুগ পরেও এ দেশের ডেপুটিরা টাকা ৩২৫-১০০০ বেতনক্রমে কাজ করতেন। মাইনে ছাড়া অন্য কোনরকম ভাতা তাঁরা পেতেন না। হাল আমলে এঁদের জন্য যে সংশোধিত বেতনক্রম ধার্য করা হয়েছে সেখানেও তাঁদের বেতনের সর্বোচ্চ সীমা মাত্র ১৬শো টাকা। কাজেই সেই হিসেবে আজ থেকে প্রায় সওয়াশো বছর আগে এঁরা যে ১ হাজার টাকা সর্বোচ্চ মাইনে দাবী করেছিলেন, সেটা আপাত দৃষ্টিতে হয়ত অনেকেরই অসঙ্গত বলে মনে হতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে এ যুগের মত সে আমলেও কর্মচারীদের তরফে মাইনে বাড়ানোর দাবীগুলোর মধ্যে একটু মাত্রাতিরিক্ত উচ্চাশার ঝোঁক দেখা যেত। উচ্চাশাটা যে যথার্থ কি পরিমাণ ছিল তা বুঝতে হলে ডেপুটিরা তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বাস্তবিক কি মাইনে পেতেন সেটা জানা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ১৮৭২ সালে পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিতে এসে গে এবং হ্যারিসন নামে দুজন পদস্থ রাজকর্মচারী যে তথ্য পেশ করেছিলেন সেটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। এঁদের বিবৃতি অনুযায়ী উল্লিখিত সময়ে একজন ডেপুটি কালেক্টর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

প্রদেশগুলিতে গড়ে মাসিক ২৫০-৮০০, বোম্বাই প্রদেশে ৩০০-৫০০ এবং মাদ্রাজ প্রদেশে ২৫০-৬০০ টাকা বেতন পেতেন। এই যেখানে অবস্থা সেখানে ১৮৬৮ সালে ৪০০-১০০০ টাকা মাস মাইনে দাবী করা একটু অবাস্তব ঠেকে বইকি!

কিন্তু একটু গভীরভাবে বিচার করলে এই দাবীর সমর্থনে কয়েকটা যুক্তি উপস্থিত করা যায়। প্রথমত, মাইনের ব্যাপারে ইংরাজ সরকার ভারতীয় ও ইউরোপীয় কর্মচারীদের মধ্যে একটা নিদারুণ বৈষম্য সৃষ্টি করেছিলেন। বস্তুত একই রকম চাকরির দায়িত্ব পালন করে একজন ইউরোপীয়ান তাঁর সহকর্মী ভারতীয়ের চাইতে বহুগুণ বেশি মাইনে পেতেন। পূর্বে উল্লিখিত গে এবং হ্যারিসন তাঁদের সাক্ষ্যে এ কথা কবুল করেন যে, একজন ভারতীয়ের তুলনায় একজন ইউরোপীয়ান অন্তত ছয়গুণ বেশি মাইনে উপার্জন করতেন। অবশ্য অনেক সদাশয় ইংরাজ সমকাজের জন্য সমবেতন দানের নীতিকে মেনে নেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন মহলে অনুরোধ জানান। কিন্তু এঁদের কথায় কান দেওয়া হয়নি। বস্তুত সরকারের নীতি নির্ধারক আমলারা মনে করতেন যে ইউরোপীয়ানদের তুলনায় ভারতীয় কর্মচারীরা নিতান্ত অপদার্থ। তাছাড়া টাকা রোজগারের জন্য তাদের ইউরোপীয়ানদের মত দূর বিদেশেও ছুটে আসতে হয়নি। সুতরাং ভারতীয়রা কেন এঁদের সমান মাইনে পাবেন? এই রকম একজন আমলা (অদৃষ্টের কি পরিহাস-এঁর নাম Wise) তো প্রকাশ্যে বলেই বসলেন "I do not think the native Deputy Magistrates are good; they greatly want courage and activity; they are generally lazy and prejudiced, and I think they have not answered so well as good Europeans." অতএব মাইনের ফারাক চলেই ছিল এবং কতকটা সেই কারণে ভারতীয়রাও এই অসম্মানজনক বেতনবৈষম্য দূর করার জন্য বেশি মাইনে দাবী করেছিলেন।

কিন্তু এইসব সেন্টিমেণ্টাল ব্যাপার বাদ দিয়েও এ কথা বলা চলে যে ভারতীয়দের পক্ষে বেশি মাইনে দাবী করার জন্য আর একটি বাস্তব কারণ ছিল। তা হল এই যে, অবসর নেওয়ার পর ভারতীয় চাকুরিয়াদের জন্য সরকারের তরফে প্রায় কোন রকম সংস্থান করা হত না। পূর্বে এক সময় ফ্রান্স ওয়ার্ডেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তহবিল থেকে সকল শ্রেণীর আনকভেনেণ্টেড কর্মচারীদের পেন্সন দেওয়া হত। কিন্তু কালক্রমে ভারতীয়দের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর বা কোন কারণে চাকরি চলে গেলে এঁদের অবস্থা রীতিমত শোচনীয় হয়ে উঠত। জে, পেস্টনজী নামে জনৈক পার্শি

ভদ্রলোক ১৮৫৩ সালে পার্লামেণ্টের কাছে সাক্ষ্য দিতে এসে বাজোনজী নামক একজন কর্তব্যপরায়ণ সরকারী কর্মচারীর কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই ভদ্রলোক কর্মরত অবস্থায় মারা গেলে তাঁর বিধবা ও দুটি সন্তানের ভরণ পোষণের জন্য কোম্পানী বাহাদুর প্রথমে মাসিক কিঞ্চিদূর্ধ্ব ২২ টাকা পেন্সন মঞ্জুর করেন। কিন্তু পেন্সনের টাকা দেওয়ার আগেই অন্য আর এক অছিলায় তা কেটে নেওয়া হয়। বিধবা ও তাঁর পরিবারের তরফে অনেক অনুনয় বিনয় করা সত্ত্বেও সরকারের মন গলানো যায় নি। এ রকম আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। এগুলি আলোচনা করলে ভারতীয়রা যে কেন যৎকিঞ্চিৎ বেশি মাইনে দাবী করেছিলেন তার কারণ বোঝা যায়। চাকরিতে থাকাকালেই তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান করে যেতে হত। কাজেই বেশি অর্থের প্রত্যাশা করা তাঁদের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না।

মৃত্যুজনিত অনিশ্চয়তায় সকলকেই ভুগতে হয়। কিন্তু ভারতীয় চাকুরীয়াদের এ ছাড়া অন্য আর এক ধরনের অনিশ্চয়তা ছিল। কবে কোন্ ছুতোয় যে তাঁদের চাকরি চলে যাবে সেই ভয়েই তাঁরা সদা সর্বদা আতঙ্কিত হয়ে থাকতেন। ঊনবিংশ শতকের রেভিনিউ প্রসিডিংস (বেঙ্গল) এর নানা খণ্ডে বিভিন্ন তুচ্ছ কারণে কত যে ভারতীয়ের চাকরি গিয়েছিল তার হিসেব দেওয়া আছে। ১৮৪৪ সালের ২৭শে মার্চের একটি মাত্র ছোট তালিকাতেই কমপক্ষে সাতজন ডেপুটি কালেক্টরের চাকরি খতম হওয়ার কাহিনী রেকর্ড করা আছে। এঁদের মধ্যে কারো চাকরি যায় বদলির হুকুম সঙ্গে সঙ্গে মান্য না করার দোষে, আবার কেউ বা ডেস্কের ফাইলের তলায় একছত্র কবিতা লেখার অপরাধেও কর্মচ্যুত হন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে চাকরি থেকে ছাঁটাই করার ব্যাপারেও বর্ণবৈষম্য করা হত। ১৮৫৩ সালে পার্লামেণ্টে সাক্ষ্য দিতে এসে রবিনসন এক কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করেন। সেটা হল এই যে, জনৈক উচ্চপদস্থ ইউরোপীয়ান রাজকর্মচারী তাঁর সরকারী বাংলো বেআইনী ভাবে ভাড়া দিয়ে বেশ কিছু অর্থোপার্জন করেন। আর ঐ একই সময় একজন স্বল্প বেতনভোগী তহশিলদার সেরেস্তার ঘোড়া ভাড়া দিয়ে একবার অল্প কিছু টাকা আত্মসাৎ করেন। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে সরকার ইউরোপীয়ান কর্মচারীটিকে মৌখিক ভর্ৎসনা জানিয়ে অব্যাহতি দেন। অথচ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গরীব নেটিভ কর্মচারীটিকে একটা বিভাগীয় তদন্তের প্রহসন করে চাকরি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। এইসব আরো অনেক উদাহরণ সহযোগে ভারতীয় চাকুরিয়াদের ইউরোপীয়ানদের তুলনায় কত

লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেওয়া হত তা সহজেই প্রমাণ করা যায়।

কিন্তু শুধু বেতনবৈষম্য এবং চাকুরীগত অনিশ্চয়তাই নয়। ভারতীয়দের প্রতি অন্য আর এক ভাবেও ইংরেজ সরকার অবিচার করে এসেছিলেন। ইংরাজ আমলের গোড়ার দিকে এ দেশের কোভেনেন্টেড চাকরিগুলিতে কেবলমাত্র সাহেবদেরই নেওয়া হত। কোভেনেন্ট মানে চুক্তি। বিলেত থেকে যেসব সাহেবরা কোম্পানীর চাকরি নিয়ে এ দেশে আসতেন তাঁদের সঙ্গে কোম্পানীর যে চুক্তি হত তার নানা শর্তের মধ্যে চাকুরীপ্রাপ্ত ব্যক্তিটিকে বিদেশে এসে সততার সঙ্গে কাজ করতে হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিতে হত এবং এই জন্যই এগুলিকে কোভেনেন্ট চাকরি বলা হত। এইভাবে চুক্তি সই করিয়ে নেওয়ার অনেক কারণ ছিল। ক্লাইভ থেকে শুরু করে ম্যাকফার্সনের আমল পর্যন্ত যাঁরা বিলেত থেকে এ দেশে চাকরি করতে এসেছিলেন অনুসন্ধান করে দেখা গেছে তাঁরা অসাধু উপায়ে প্রচুর বেআইনী অর্থ উপার্জন করে নিতেন। খোদ লর্ড ক্লাইভেরও এ ব্যাপারে রীতিমত বদনাম ছিল। সাহেব কর্মচারীদের এই অসাধুতা দমন করবার জন্য কর্ণওয়ালিশ এদের মাইনে প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এঁদের কাছ থেকে সৎ থাকবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে চুক্তি সই করানো হত।

এত আঁটঘাট বেঁধে যে কোভেনেন্টেড পদের সৃষ্টি করা হয়েছিল সেখানে যাঁরা চাকরি করতেন তাঁদের মধ্যে কিন্তু সৎ ও দক্ষ লোকের রীতিমত অভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৮৩৭ সালে বিলেতের হাউস অফ কমন্সে সাক্ষ্য দিতে এসে ভারতের প্রাক্তন গভর্ণর লর্ড বেন্টিংক এই সব কভেনেন্টেড অফিসারদের সম্পর্কে তিক্ত মন্তব্য করে বলেন এঁরা চাকরির দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন এবং এঁদের হাতে রাজস্ব, বিচার এবং পুলিশ অর্থাৎ প্রশাসনের সকল বিভাগেই ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের কাজে ব্যর্থ হলেও এইসব সিভিলিয়ানরা যে ছাত্র হিসেবে বিশেষ কৃতি ছিলেন এই রকম একটা ধারণা সাধারণ ভারতবাসীর মনে কিভাবে যেন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তবে স্প্যানজেনবার্গ নামে জনৈক লেখক হালে গবেষণা করে এই আজগুবি ধারণার অবসান ঘটিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে এইসব জাঁদরেল আই. সি. এস. রা আসলে মাঝারি মেধার মুখস্থ বিশারদ ("Cramming men of mediocre calibre") মানুষ এবং স্বদেশে এঁরা কেউ-ই ভাল ছাত্র বলে পরিচিত ছিলেন না। ভারতবর্ষে যাঁরা নিতান্ত স্বল্প বেতনের চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন, কিংবা চাকরি না পেয়ে যাঁরা মাস্টারী বা

অফিসের বড়বাবু ইত্যাদি তথাকথিত আটপৌরে বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের অনেকের সঙ্গেই এইসব ডাকসাইটে সিভিলিয়ানদের তুলনা করলে বড় নিষ্প্রভ মনে হতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ঋষি অরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসু সরকারী স্কুলে হেডমাস্টার হয়ে জীবন শেষ করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অবস্থা তুলনায় কিছুটা ভাল—তিনি ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা যিনি নিরূপণ করেন সেই গণিতবিদ রাধানাথ শিকদার, উভয়েই স্কুলের ৬০ টাকা মাইনের সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকরি পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত মাইকেল মধুসূদন কলকাতার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে বড়বাবু হিসেবে চাকরি করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল এবং নবীন সেনের মত নামজাদা ঔপন্যাসিক এবং কবিদেরও স্রেফ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েই জীবন কাটিয়ে দিতে হয়েছিল। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই, বঙ্গভারতীয় এইসব দিকপালেরা চাকরি জীবনে পদোন্নতির কোন সুযোগ পান নি।

বস্তুত ভারতীয়রা যাতে এ দেশের বড় চাকরিগুলিতে কোনভাবেই ঠাঁই না পান সেজন্য ইংরাজ সরকার ভারতীয়দের নানা অছিলায় বাধা দিয়ে এসেছিলেন। ১৮৫৪ সালে আই. সি. এস বানানোর জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হল। নিয়ম অনুযায়ী সাহেবরা স্বদেশে বসেই এই পরীক্ষা দিতে পারতেন, অথচ গরীব ভারতবাসীকে পরীক্ষা দিতে হলে বিলেতে ছুটতে হত। তাছাড়া পরীক্ষায় ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি নানারকম বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হল। কিন্তু সেগুলি ভারতবর্ষে বসে শিখবার কোন উপায়ই ছিল না। বহু আন্দোলনের পর সংস্কৃতকেও আই. সি. এস. পরীক্ষার অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই বিষয়ে উঁচু নম্বর পেয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আই. সি. এস হবার পরেই ১৮৬৩ সাল থেকে ঐ বিষয়ের পেপারে পূর্ণসংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হল। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। ভারতীয়রা সংস্কৃতে সহজেই ভাল ফল করতে পারে, কাজেই তাঁদের রুখবার জন্য ঐ বিষয়ের অবমূল্যায়ণ করা হয়েছিল। কিন্তু এটাই শেষ নয়। ভারতীয়রা যাতে এই পরীক্ষায় বসতে না পারে তার জন্য ১৮৭৬ সাল থেকে প্রার্থীদের উচ্চতম বয়সের সীমা ২৩ থেকে কমিয়ে ১৯ বছরে নামানো হয়েছিল।

ফলে যা হবার তাই হয়েছিল। বাংলাদেশে সিনিয়র স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য যে পরীক্ষা নেওয়া হত হালফিলের গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, সেই পরীক্ষার

প্রশ্নপত্রও অনেক সময় বিলেতের আই. সি. এস. পরীক্ষার প্রশ্ন থেকে কোন অংশে কম কঠিন হত না। অথচ এই পরীক্ষায় পাশ করে এবং গভর্ণমেণ্টের স্কলারশিপ পেয়ে বাঘা বাঘা ভারতীয় ছাত্ররা শেষ পর্যন্ত স্কুল মাস্টার কিংবা বড় জোর ডেপুটি হতে পারতেন। দারিদ্র্য এবং পরাধীনতার অপরাধে তাঁরা বিলেতে গিয়ে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে আই. সি. এস বনতে পারতেন না। সেই দেবদুর্লভ চাকরিগুলি অন্তত উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত শুধু বিলেতের নিতান্ত সাধারণ স্তরের ছাত্রগুলির জন্য নানা কায়দায় একচেটিয়া করে রাখা হয়েছিল। অতএব অভাগা ভারতবাসীরা নিজ বাসভূমে পরবাস হয়েই রইলেন। সুদীর্ঘ কালের ইংরাজ শাসনের এটাই হল সব চেয়ে বড় ট্রাজেডি। ভারত ভাগ্যবিধাতা যে বুরোক্র্যাসির জন্য ভারতবর্ষকে মাইনে যোগাতে হয়েছিল তাকে 'মিডিওক্র্যাসি' বললে হয়ত শব্দের অশুদ্ধ প্রয়োগের দোষ ঘটবে, কিন্তু তার জন্য আর যাই হোক ইতিহাসের অপব্যাখ্যা হবে না।

দিলীপ রায়ের কবিতা

ইন্দ্র গুপ্ত

হৃদয়গভীর থেকে উৎসারিত নির্ভেজাল পবিত্র কবিতা—দিলীপ রায়ের কবিতার প্রথমপাঠ আমাদের এই ধারণার কাছে নিয়ে যাবে। নতুন এই দিলীপ রায়ের রচনা এর আগে কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ে না। সম্ভবত এই তার প্রথম প্রকাশ। তরুণ প্রজন্মের কবিদের সাম্প্রতিক লেখায় প্রকরণপ্রক্রিয়া ও কুশল শব্দবন্ধের যে চতুর ব্যবহারিক দক্ষ কৃত্রিমতা লক্ষ্য করা যায়, দিলীপ রায় তা থেকে মুক্ত। সম্পূর্ণই অন্তরমুখী এই কবি আধুনিক কবিতার ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলানোর সঙ্গদোষ থেকে একেবারেই মুক্ত।

এই একগুচ্ছ কবিতা বহুদিন পর আমাদের মনে নির্ভেজাল নির্মল কবিতাপাঠের আনন্দ এনে দিল। নির্ভেজাল শব্দটি ইচ্ছে করেই দ্বিতীয়বার ব্যবহৃত হ'লো। কিছু কিছু ভেজাল আছে যা উজ্জ্বলতা বাড়ায়। স্বর্ণে যেমন তামা, কবিতায়ও তেমনি ছন্দপ্রকরণের প্রসাধন। কিন্তু মূল ধাতুটি যেমন স্বর্ণ না হলে চলে না, কবিতাপ্রতিমার সঙ্গে আভরণ অরোপ করার আগেও তেমনি দেখা দরকার সে মূল রক্তমাংসের মান্য মানবী কিনা—যার নিশ্বাস পুরুষস্পর্শে ঘন হয় দুজনের নির্জনতা নিখাদ ভালোবাসায় হয়ে ওঠে সোনা।

মুখের কথা প্রেমের কবিতার এই গুচ্ছে আমরা এক নিখাদ প্রেমিককেই আবিষ্কার করি। চাকচিক্যের কথা, ছন্দপ্রকরণের কথা একবারো মনে পড়ে না। প্রায় ঘাড় ধরে তিনি আমাদের পড়িয়ে নেন তার কবিতা। প্রথম আত্মপ্রকাশে এটা আমাদের কম প্রাপ্তি নয়।

দিলীপ রায়ের পাঁচটি কবিতা

তাঁর নির্জন চোখ

যা করে তোমাকে দ্বিধা, আশৈশব, ভেবো না
কেউ-না-কেউ চোখ রাখছে
মঞ্চে যে-ভাবে সম্পাত হয় চরিত্রে-চরিত্রে, ক্ষণে ক্ষণে, ভ্রাম্যমান আলোক
কেউ না কেউ চোখ রাখছে তোমার ওপর
মনে মনে
যাঁর কাছে সঁপে রাখো তোমার
অন্ধকার, তোমার বিধুর বিশুদ্ধ রক্ত আর অনাবিল বিভ্রান্তি
ভেবো না, কেউ না কেউ চোখ রাখছে

শুনে হয়তো চমকেই উঠবে, কেন না তিনি তো ওসবের সমাধানই করেন নি
বরং তাঁর যত্ন-আত্তি পেয়ে ওরা
লাফিয়ে লাফিয়ে বড় এবং সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল
কারণ তো তাঁর একটাই ছিল
এসব থেকে তোমার থির থির হাতে
তুলে দেবেন এক ফুল
উজ্জ্বল-অনন্য নয়ন-নন্দিত
ঠিক বনানীর গন্ধ-ভরা তোমার চরিত্রের মতো
কেউ না কেউ চোখ রাখছে
আমরা দেখছি তোমার হাতে
বিরাজ করছে তিমির-বিদারী প্রস্ফুট নীল
হিল্লোলিত অমেয় ফুল
আমরা আশ্বস্ত হচ্ছি……

অবিনশ্বর

এসো, কাছে বসো, সব ছেড়ে যাবার আগে, খুব কাছে,
যেখানে ভালোবাসা থাকে
কথা বলো, বেশী নয়, দু'চারটে, যা ভেসে থাকবে হৃদয়ে চিরকালের
একা দুঃখী বলের মতন

নীলের দিকে যেতে যেতে, আমার ঈষৎ ইচ্ছে,
কোন ঐশ্বরিক প্রদোষে, ঘাসে ঘাসে
রেখে যাই তোমার গন্ধ, আমার গন্ধ, এই শিশিরের গায়ে গায়ে

এসো, চলো যাই একটু অরণ্যে, যেতে যেতে তোমার চকিতের চোখ যেন
শিলীভূত করে রাখে, আমার যা ভালবাসা, এই অরণ্যের গভীরে

বড়ো হেঁটেছি এতদিন, চলো যাই, গিয়ে বসি, বটবৃক্ষ ঐ যে বিরাট,
তার স্নেহের ছায়ায়
কোন একটি বটের পাতা, সেই কতকালের সরু এক ইচ্ছে,
কেউ যেন মনে রাখে…
আমরা এখানে এসে হয়ে উঠেছিলাম……

পাতারা টেনে নিয়েছিল সূর্য থেকে, মাটি থেকে, হাওয়া থেকে
শিরায় শিরায় রক্তের কণায় কণায় সেইসব অবিনশ্বর কথা
তোমাকে আমার ভালবাসা……

তুমিও এক অরণ্য

নকসা-কাটা আলপিনের শজারু-খাট, শুয়ে থাকি ইদানিং দিব্যি
দেখে-শুনে চলা-ফেরা, তবুও অভ্যস্ত সারল্যে
কখন পায়ে পায়ে গেঁথে যায়
নিহিত পেরেকের বিষাক্ত সঙ্গীত
রক্ত ঝরে, রক্ত ঝরে, অবিরল রক্ত ঝরে
তোমাকে আঁকি, তোমার ছবি চিনি, মেলে ধরি রোদে,
রোদ নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে যায় কোথায় কে জানে
কাকেরা চ্যাঁচায়, ঝাঁকে ঝাঁকে, এলোমেলো বড়ো, বড়ো একটানা
জীর্ণ মন্দিরের পায়রা উড়ে যায় টুকরো টুকরো আকাশে

আমি যেতে চাই বিশিষ্ট কোথাও তুমি যদি চাও নিয়ে যেতে
খুঁজে ফিরি তাকে, তোমাকে চোখে চোখে রেখে,
এখানে সেখানে, যেখানে যতটা
যাওয়া চলে
আলো-ফাটা ভোর থেকে নিটোল নৈঃশব্দে
পাই না তারে, এন্তার শুধু ঘোরা-ফেরা, সবকিছু ফণিমনসায় ঘেরা

সব রক্তেরই নিজস্ব গন্ধ থাকে
গভীর বিশ্বাসে তোমার সামনে রেখেছি জানি এক কাপ বিশ্বস্ত রক্ত
চোখের শব্দে কাউকে যেন বলা, শুধু বলেই যাওয়া
নদীরা তোমাকে আমাকে যেমন বলে যায়
প্রতিদিন
কত রক্ত আসে, রক্ত কত যায়, উৎস থাকে সঠিক

অরণ্য সবাইকে টানে, তুমিও এক অরণ্য
অরণ্যের ভিতর অরণ্যে সবাই হারায়, হারাব আমিও
হারাতে হারাতে অরণ্যের ঘেরা টোপে জটিলতায় গভীর কালো জলে
কল্লোলিত উল্লাসে
আমার স্তব্ধতা-ক্ষীত অস্তিত্ব ভেসে যায়
আকাশ শুধু এসব ছাখে, কোনো বিশেষ বর্ষায়
তোমাকে জানাতে, যেহেতু সব বর্ষার নিজস্ব গন্ধ থাকে···

টান

তোমার টানে আমি যদি নীল ঈর্ষা হয়ে যেতে পারি আমি বলবো
ঈর্ষা, তুমি কী নীল-সুন্দর ঈর্ষা
তোমার জন্যে আমি যদি ভিজে যাই আর্তশব্দের বর্ষায়, আমি বলবো
আর্তনাদ তুমি এক সুন্দর বর্ষা
তোমার টানে আমি যদি চলে যাই ফর্সা অন্ধকারে, আমি বলবো
আরো, কিছুক্ষণ থাকো তুমি, অন্ধকার, আমার সংগে
সভ্যতার মনোহর খোসা ছাড়িয়ে তোমার ভালোবাসা তন্ন তন্ন খুঁজতে খুঁজতে

আচমকা যদি খসে যাই
আমি বলবো, তোমার কী অম্লান অর্ঘ
আমার এই তৃষ্ণার্ত অংগে···

দরজা একদিন ভাংগবেই

পৃথিবীর সেই প্রথম সূর্যের করাল তাপপুঞ্জ ধুয়ে গেছে,
তখনো নাগাড়ে পুড়ে গেছে
কেবল পুড়ে গেছে
আমার অনুভূতির স্ফটিক-স্বচ্ছ ত্বক, আমার স্বপ্নের বিভোর সংলাপ, সত্তায়
সংগৃহীত অনুপম কিছু তোমার অক্ষয় ছবি
নদ-নদী, সমুদ্র, বিশাল পর্বত-সমাকুল শাসন
স্বচ্ছন্দে আশ্চর্য বিলাসে কিংবা এলানো অভিলাষে তো বেশ উৎরে গেছ
সব সিঁড়ি যা গতিকে করে রাখে ব্যাহত
তোমার গানের নিঃশ্বাসের শব্দে পর্দাগুলো সব ওড়ে
জলে যেভাবে হালকা হাওয়া খাঁজ-কাটা জমিন
তুমি সুখের ঘুমে একটু একটু ঢলে যাও···

সহসা থমকে গেছে আমার নিটোল ক্লান্তি,
দাঁড়িয়েছে আমার মৃত্যু-ধোয়া সাহারাও যেন
ঐ তো পেয়ে গেছি তোমার স্থিতির স্থাপনা, ঐ তো তুমি ঘুমে কী সুন্দর সুখী
আমার দু'পাশে, যেখানে হৃদয়ও যাকে, দুই নদী, অন্ধকার বালুকা জমে
রক্তের নৌকো যাবে না যে, তবু সংগে আনতে ভুলি নি,
এই হিম ঠাণ্ডায়, আমার
প্রিয় বাঁশীখানি, যেখানে তোমার স্মৃতির হৃৎপিণ্ড, আমার নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে
এখনো ওঠে নামে, চলকে ছলকে ওঠে এখনো
আজো উঠেছে, উদ্গত রক্তের স্তরে স্তরে আত্মা পড়ে গেছে ঢাকা, আমি জানি
তুমিও শুনেছ, তুমিও দেখেছ বাঁশীর আত্মার নির্যাতন এই, তোমার হাতে আর
আশ্চর্য গরিমায় রাত্রির অতল জলে ডুবে গেছে, তোমার সামনে পরম নির্ভরতায়
বাঁশীর কর্ণভেদী আর্ত শব্দ, আর তখনো দরজা খোলো নি
গরিমার এই দরজা একদিন আমি ভাংগবোই···

শামশের আনোয়ারের কবিতা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

ষাটের দশকের অন্যতম প্রধান কবি শামশের আনোয়ারের কবিতার বিশিষ্টতা হ'লো এই যে, তিনি এক ধরণের expressionism -কে আমদানি করেছেন তাঁর কবিতায় যা তাঁর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোনো বাঙালি কবির মধ্যেই ততোটা লক্ষিত হয় না। expressionism বা অভিব্যক্তিবাদ য়ুরোপীয় শিল্প-সাহিত্যে একটি বিশেষ আন্দোলন—ভ্যান গখ্, কোকোস্কা (যিনি শুধু ছবিই আঁকেন নি), টলার প্রমুখ শিল্পী সাহিত্যিক তাঁদের ভেতরকার জ্বালা-যন্ত্রণা ও নানাধরণের টানাপোড়েন (য়ুরোপীয় সমালোচনায় একটি সুন্দর শব্দ ব্যবহৃত হয় এক্ষেত্রে : augst) বহির্বিশ্বের ওপর চড়া রঙে চাপিয়েছিলেন। শামশেরও তাই করেছেন, তবে নিজস্ব রীতিতে, নিজস্ব ঘরানায়। তাঁর একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থে "মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে" যার সূচনা হয়েছিলো দীর্ঘদিন আগে, তাই নানা খাতে প্রবাহিত হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর সাম্প্রতিক কবিতায়। শামশেরের অভিব্যক্তিবাদের একটি প্রধান অবলম্বন হলো নারী ও নরনারীর যৌন সম্পর্ক—যা আলোচ্য অধিকাংশ কবিতাতেই প্রকাশিত হয়েছে। এই যৌনচেতন যন্ত্রণা, শামশেরের অভিব্যক্তিবাদের দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি এই কবিতাগুলি থেকে—

(১) "রুদ্ধ ঠোঁট, রুদ্ধ স্তন
রুদ্ধ যোনির মেয়ে, মার্বেল
দিয়ে সাজানো চোখের বাঘ" (নাম)

(২) ব্লেড তোমার কাজ তুমি ক'রে যাও
নাচো রক্তে মাথার ভিতর
উজ্জ্বল বাহু ও শাণিত গ্রীবা তুলে— (অনুগামী) প্রভৃতি

আসলে শামশেরের বিরোধ বোধহয় সমাজের জরাজীর্ণতার সঙ্গে—তাই একধরণের বেপরোয়া রুক্ষতার চর্চা করতে করতে তিনি যখন লেখেন "ছন্দের ব্যবহৃত মাড়ী। ঠেলে বেরুচ্ছে ঐ ফোয়ারা থেকে" তখন আমাদের আধুনিক কানে একটুও বেসুরো লাগে না।

তাহ'লেও শামশেরের কবিতার যে তাজা, টাটকা ব্যাপারটা আমাকে বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করে, তা কিন্তু শুধুই যৌবন যন্ত্রণা বা যৌনযন্ত্রণা নয়—মস্তিষ্কের অন্তঃক্ষরণ অনেকটাই কাজ করছে তার ভেতরে। 'শিল্প' কবিতাটাই "স্যুচে"-র চিত্রকল্প যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা আমার বক্তব্যকে সমর্থন করবে। আবার তারই সঙ্গে এই সীবন-কর্ম যেন ঈষৎ স্যুররিয়ালিষ্টিক, আবার পুরোপুরি তাও নয়। "এক পৌরাণিক জীবের"-র শেষ দুটি লাইনের চিত্রকল্প সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়।

বোদলেয়র হয়তো শামশেরের মূল প্রেরণা ছিলো কখনো, কিন্তু বোদলীয়রীয় নির্বেদকে তিনি expressionist যন্ত্রণায় অনেক টানটান করে বেঁধেছেন। যেমন :

"অনেক আগে
চুল ছড়িয়ে থাকা—বোকা হাবা, অচেতন এক সন্ধ্যা
সে চারিপাশে ঘোরে আর আমাদের
মগজে ছড়িয়ে দেয় পক্ষাঘাত" (কাক)

আট নম্বর কবিতা "কলমে" তিনি উচ্চারণ করেছেন এক মমত্বময় উপলব্ধি : "ওটা আমাদের গভীর বন্ধুত্ব না। ভয়ঙ্কর শত্রুতা বুঝতে পারি না"।

শামশের কম লিখলেও এতোদিনে ওঁর অনেক কবিতা জ'মে আছে। ওঁর দ্বিতীয় বই এখনো প্রকাশিত হচ্ছে না কেন বুঝতে পারি না।

শামশের আনোয়ারের আটটি কবিতা

নাম

পাথরের মূর্তি কি নাম ধ'রে
আমাকে ডাকবে
শুষ্ক কঠিন দেয়াল বল
কি নাম ধ'রে
শিলীভূত মাঠ আর প্রত্যাখ্যানে
ভরা কাঁটাগাছ
বন্ধ্যা জননী
অন্ধ গাড়ীর চালক, মহান

গায়ক কোনো বস্তুত বোবা
কি নাম ধ'রে তোমরা ডাকবে
হাসি যা এখন প্রস্তরীভূত
রুদ্ধ ঠোঁট, রুদ্ধ স্তন
রুদ্ধ যোনির মেয়ে, মার্বেল
দিয়ে সাজান চোখের বাঘ
হরিণ যা আজ তুলোয় ঠাসা
উলঙ্গ, ঝোলান পুরুষ ও নারী
মর্গ থেকে চিৎকার করে বল
কি নাম ধ'রে আমাকে ডাকবে।

অনুগামী

আমি মুখে ব্লেড নিয়ে ঘুরি
সাজিয়ে রাখা বেনারসীর জরি ছিঁড়ে
চলে যাব—
আয়না, তোমার গায়ে ফেলে যাব স্থায়ী দাগ
যত্নে রাখা বইগুলো ছিঁড়ে যাবে
প্রিয় লেসের ঢাকনা ভরে যাবে রক্তপাতে
আর গান, প্রিয় সঙ্গিনী
যাওয়ার আগে দুফালা করে যাব তোমার জিভ
ব্লেড তোমার কাজ তুমি করে যাও
নাচো রক্তে মাখার ভিতর
উজ্জ্বল বাহু ও শাণিত গ্রীবা তুলে—
যে পোশাকে নাচো ছেঁড়ো সেই
পোশাকের ফিতা
যে মেঝেয় নাচো কাটো সেই
মেঝের ভিত
আমার চুম্বন হবে শুধু তোমার অনুগামী।

দুঃসহ

মগজের থেকে যে ফোয়ারা বইছে
তাতে কি রক্তের রঙ লেগে আছে
লেগে আছে কি বাসি জীর্ণ অশ্রুর রঙ
মৃত গলিত সন্তানের স্রাবে কি
ভরে গেছে ঐ ফোয়ারা
ভরে গেছে মৃত অপচয়ে
বিষ খাওয়া নেংটি ইঁদুরের দল
ইতিহাস আর পুরাণের বই
নষ্ট আবৃত্তিকার : ছন্দের ব্যবহৃত মাড়ী
ঠেলে বেরুচ্ছে ঐ ফোয়ারা থেকে
মগজের থেকে যে ফোয়ারা বইছে
তা কি আমারই দুঃসহ জীবনের বমন
যত দুঃসহ লাগে তোমাদের
আমার লাগে তার চেয়ে বেশী।

শিল্প

একটা সুচ ছুটে বেড়াচ্ছে ঘরের ভিতরে
তার দেহ উজ্জ্বল এবং ভঙ্গী বেপরোয়া
চোখ দুটো বারবার এসে পড়ছে
আমার চোখে
ওকি তাহলে হৃৎপিণ্ডে ঢুকতে চায়
ধারণ করতে চায় আমার সন্তান
ওকি তাহলে
আমার রক্ত শিরা উপশিরায়, হৃৎপিণ্ডে
অজানা জটিল ধূসর সব গতিপথ বেয়ে
ক'রে যাবে ওঠানামা……

অদ্ভুত এই পদ্ধতি, রীতি, ভয়াবহ
এই পরিশ্রম থেকে বিক্ষিপ্ত হবে
কি তাহলে টেনে বের ক'রে আনা
রক্তময় শিহরিত আদি মৃত্যুবীজ—
ঐ সূচ নেবে আমাকে, নেবে সারাৎসার
আমি জন্ম নেব রোজ সূচের গর্ভ থেকে
কষ্টকর মোহময় জন্ম।

একটি আধুনিক ঘটনা

আত্মায় ভর করেছে দীর্ঘ কালো রাত
ঘোর অমাবস্যা
আলো নেই
উপায় নেই কোথাও আশ্রয় নেওয়ার
হাওয়া নেই এক ফোঁটা
সামান্য একটা ঘাসের কুটো দেখা যায় না
এমনই বিরাট নিশ্চল অমাবস্যা
আর, সেই সুযোগে এক কালান্তক বিছে
মারাত্মক স্থির প্রতিজ্ঞ হুল বসিয়ে দিল
আমার আত্মায়
এখন আমার আত্মার রঙ উষার মত
এখন গোপন হত্যায় পটু···কাম-বিলাসিনী
ঐ উষার দগদগে গোলাপী রঙ ছড়িয়ে আছে
আমার আত্মায়
আলো, উষার গা থেকে কাপড় খুলে নিলে
আমার আত্মার রঙ হবে চেতনাহীন
বিবস্ত্র সাদা
আর তা, মিশে যাবে দিনের ধবধবে আলোয়
যেমন মিশে যায় অন্য সব হত্যা।

কাক

অনেক দূর থেকে তোমরা সর্বনাশ
ডেকে আনো
অমঙ্গলময়, কালো মার্বেলের বল
আনো টেনে
সন্ধ্যাকে ডেকে আনো সন্ধ্যা হওয়ার
অনেক আগে
চুল ছড়িয়ে থাকা—বোকা হাবা, অচেতন
এক সন্ধ্যা
সে চারিপাশে ঘোরে আর আমাদের
মগজে ছড়িয়ে দেয় পক্ষাঘাত
তোমরা ডাকো
প্রিয়জনের মৃত্যু সংবাদ আনো ডেকে
আমার না জন্মান পঙ্গু বোবা শিশুদের
ডেকে আনো
দুপুরটাকে তোমাদের ডাক এক বিশ্রী
আবছায়া গুহার মধ্যে ঢেকে দেয়
আর সন্ধ্যায় তোমাদের কর্কশ, হিংস্র
ডাক শুনে
ধানের গাছ লজ্জা পায়, বিবস্ত্র
বোধ করে
তোমরা ডাকো
তারস্বরে ডাকো এবং ছড়িয়ে দাও
সদ্য-মৃত লোকেদের কালো চামড়া লাগানো
ঠিকরে পড়া
অসংখ্য পচা আর গলিত চোখ।

এক পৌরাণিক জীব

পিঠে কাঁটাগুলো হয়ে পড়েছে শক্ত এবং আরো অনেক উঁচু
চামড়ার ভিতর ঢুকে কামড় দিচ্ছে রক্ত এবং হাড়ে
বুকে হেঁটে এবার আমাকে চলে যেতে হবে
আলমারিতে পোর্সিলিনের পুতুল আর
কেবিনেটে সাজানো রিঅ্যাল উইলো
মেঝেতে বিছানো আমার প্রিয় কার্পেট
সব ছেড়ে, রাত্রির আঁধারে, বুকে হেঁটে, আর
তলপেটে ভর করে চলে যেতে হবে
নিষ্ঠুর নদী গঙ্গার ধারে
অদ্ভুত আর অপরিচিত আমাকে
গঙ্গা ফিরিয়ে দিবে
কৃশকায়, ক্ষিপ্র ও হিংস্র বালকেরা
ছুটে আসবে অভ্যর্থনায়
আর আসবে কৌতূহলী ব্যস্ত জেলেরা
দীপ্ত কুড়াল হাতে।

কলম

কলমের ব্যারিকেড ভেঙ্গে ঢুকে পড়লাম
পিছনে দুর্গ, সামনে মাঠ
অসংখ্য কলমের মৃতদেহ ছড়িয়ে
আছে মাঠে
আমি ঐসব মৃতদেহের ওপর আস্তে আস্তে
ও উদাস হাঁটতে হাঁটতে
ভাবি এটা আমার সার্থকতা, নাকি
চূড়ান্ত পরাজয়
কলম আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু এবং প্রধান শত্রু

জেগে থাকলে আমি কলমের অবিরল
কুচকাওয়াজের শব্দে বারবার চমকে উঠি
ঘুমিয়ে পড়লে কলমের যুদ্ধ-জাহাজ
পতাকা উড়িয়ে ভাসে ঘুমের ভিতর
এই তো কিছুদিন আগে কলম আমার
ব্যারিকেড ভেঙ্গে ঢুকে পড়েছিল
এই কবির অসংখ্য ছড়ানো মৃতদেহের
ওপর হাঁটতে হাঁটতে কলম ভাবছিল
এটা তার জীবনের সফলতা না
লজ্জাকর পরাজয়
কলম ও আমি এভাবে উল্টো
দিক থেকে
সারাক্ষণ পরস্পরকে লক্ষ্য করে তীব্র
বেগে ছুটে চলেছি
এটা আমাদের গভীর বন্ধুত্ব না
ভয়ংকর শত্রুতা বুঝতে পারি না।

আলোচনা

বাংলা সাহিত্যের ল্যাবরেটরী

পিনাকী ভাদুড়ী

রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' লিখেছিলেন ১৯০৩ সালে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'আঁতের কথা'। বাংলা সাহিত্যে ঐ আঁতের কথা'র এই প্রথম আগমন। তারই একটি চরম পরীক্ষা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ তার পরে সাঁইত্রিশ বছর অপেক্ষা করেছেন। এ অপেক্ষা কোন অলস অবসর যাপন ছিল না। নানা কর্মের মধ্য দিয়ে তিনি জীবনকে ওলটপালট করে দেখে নিচ্ছিলেন। ১৯৪০ সালে বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষাগারে 'ল্যাবরেটরী' গল্পের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার, অভিজ্ঞতার এবং অনুভূতির একটি রাসায়নিক দ্রবণ প্রস্তুত করতে বসেছিলেন।

এই গল্প তাঁর সমস্ত গল্পের থেকে আলাদা। তাঁর পূর্বতন গল্পের সমস্ত কাঠামো, সমস্ত সংস্কার এখানে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। 'চোখের বালি' লিখতে বসে রবীন্দ্রনাথ শেষ রক্ষা করতে পারেননি। এই কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু প্রেম, এবং সেই প্রেম অবৈধ। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন 'বিষবৃক্ষ' লিখতে গিয়ে নগেন্দ্র-কুন্দর অবৈধ প্রেমকে শেষপর্যন্ত পরাস্ত করে দিয়েছেন—সরলা কুন্দনন্দিনীকে শাস্তি দিতে ছাড়েননি—তেমনি রবীন্দ্রনাথ তাঁর চোখের বালি'র যে সবচেয়ে তেজী চরিত্র, সেই বিনোদিনীকে শেষপর্যন্ত সরিয়ে দিয়েছেন উপাখ্যানের আড়ালে। বিনোদিনীই কাহিনীর নিয়ন্ত্রণ করে চলেছিল, তবু তার সুষ্ঠু উপসংহার জোটেনি। দ্বিধাগ্রস্ত লেখক একটি নিটোল সমাপ্তি দিতে চেয়েছেন এই উপন্যাসের। সমাজ রক্ষা পেয়েছে কিনা জানিনা, তবে সাহিত্য রক্ষা পায়নি। সাহিত্য দুর্বল হলে, সমাজও

সবল থাকতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এর দুর্বলতাকে স্বীকার করে গিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুকে লিখেছিলেন—'চোখের বালি'র সমাপ্তির জন্য লজ্জিত আছি।

শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে নিজেকে অতিক্রম করে গেলেন, তাঁর 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে। ১৯০৮ সালে লেখা 'কথা ও কাহিনী'র, 'পরিশোধ' কবিতাটি 'শ্যামা'র উৎস। কিন্তু 'পরিশোধে' যা নেই, 'শ্যামা'য় তাই আছে। যে প্রেম তার আবেগের মত্ততায় কাউকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তাকেও ক্ষমা করতে না পেরে সংকুচিত হলেন এই নাট্যে। প্রেমের সেই শক্তিকে অস্বীকার করলেন না তিনি। প্রেমের ঐ সর্বনাশা কামনার জয়গান গাইলেন। 'চণ্ডালিকা'তে তিনি প্রেমকে একই সঙ্গে 'সর্বনাশ' এবং 'সর্বস্ব' বলে তার মহিমা কীর্তন করলেন।

'ল্যাবরেটরী' গল্প, ঐ অতিক্রমণের অর্থে রবীন্দ্রনাথের 'সোয়ান সং' হয়ে দাঁড়াল। এই আশ্চর্য গল্পে ররীন্দ্রনাথ, চিরকালের মতো চলে যাবার আগে, শেষবারের মতো পৃথিবীর দিকে ফিরে চাইলেন। তখন তাঁর বয়স আশির কোঠায়, দেহে তখন জরা, মৃত্যু তখন অদূরে। কিন্তু মন রয়েছে সজীব, উজ্জ্বল রয়েছে লেখনী। বিষয় নির্বাচনে, ভাষার নৈপুণ্যে, রবীন্দ্রনাথ তখনো এমন উদ্ভাসিত যে আমাদের অবাক না হয়ে উপায় থাকে না। বাংলা ভাষায় এবং বাঙালী জীবনে তিনি এক নতুন পরীক্ষা সুরু করলেন। এই গল্পের নাম 'ল্যাবরেটরী', তাই দ্বিবিধ অর্থে সার্থক। কাহিনী আবর্তিত হচ্ছে এক বিজ্ঞানীর 'ল্যাবরেটরী'কে কেন্দ্র করে, আবার মানুষের ভালোবাসার এক অতলান্ত পরীক্ষা চলেছে এক জীবনবিজ্ঞানীর হাতে। সেই বিজ্ঞানীর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভালোবাসার যে ল্যাবরেটরী তিনি গড়েছিলেন তার কোন উত্তরাধিকারী আজো জন্মগ্রহণ করেনি।

'চোখের বালি'তে ভালবাসার যে সর্বনাশ মথিত করে দিতে পারত সমস্ত চরিত্রদের জীবনযাত্রাকে, যে কারণেই হোক, শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। কিন্তু তখনই বোঝা গিয়েছিল যে এই 'আঁতের কথা' আবার বিস্ফারিত হবে।

বেশীদিন গেল না, ১৯১৬তে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'চতুরঙ্গ'। শুধু যে সাধুভাষায় লিখেও চলতিভাষার মেজাজ ভরে দিলেন এতে, তা-ই নয়, নিয়ে এলেন নতুন এক আবিষ্কার। এই উপন্যাসেও রয়েছে ভালোবাসার জন্য হাহাকার। সেই হাহাকারই এই উপন্যাসের 'আঁতের কথা'। জীবনের অন্বেষণ জীবন শেষ হবার আগেই ধরা দিল দামিনীর হৃদয়ে। মরবার আগে তাকে বলতে হল—'সাধ মিটিল না।' ভ্রমরেরও সাধ মেটেনি, মরবার আগে সে বলেছে, আশীর্বাদ করিও যেন জন্মান্তরে

সুখী হই। তুলনা করলে বলতে ইচ্ছে করে—ভ্রমর চেয়েছিল স্বামীর ভালোবাসা, দামিনী পেয়েছিল ভালোবাসার স্বামী। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর মধ্যে ভালোবাসার কান্নাহাসির যে মালা দুলছিল, তারই পালাগানের শেষ খুশীটুকু বেজে উঠেছে 'ল্যাবরেটরী' গল্পের সোহিনী চরিত্রের মধ্যে। বিনোদিনী এবং দামিনী ভালোবাসার যে আবর্তে আলোড়িত, সোহিনীর হৃদয়ে সেই ভালোবাসা এক নতুন মাত্রা পেয়ে যায়। এখানে পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক উদ্বেলতায় প্রেমের সমাপন হয়নি, তার চেয়ে অনেক বড়ো এক জীবনকর্মে সে উদ্বুদ্ধ। বিনোদিনী, দামিনী এবং সোহিনীর মধ্যে ভালোবাসা যেন তিনটে স্তর পার হয়ে আসে। বলতে গেলে, সোহিনীর ভালোবাসার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায় তার প্রেমপাত্রের মৃত্যুর পরে। যে চলে গেছে, তার কীর্তিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়ে পথ চলা সুরু করে যে বেঁচে রয়েছে। ভালোবাসার এই কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করেছেন বিজ্ঞানের পটভূমিকায়। জীবনের সমস্ত সংস্কার, শুচিতা, সতীত্ব প্রভৃতিকে দেখতে চেয়েছেন বিজ্ঞানীর নির্মোহ দৃষ্টিতে। জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে বলেই হয়তো জীবনের দিকে এমন সত্যসন্ধানের দৃষ্টি ফেলতে পেরেছেন কবি। জীবনের প্রতি কোন ইল্যুশন আর অবশিষ্ট নেই, অথচ জীবনের কর্মকে বা আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে রয়েছে। তারই উপায় খুঁজতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসাকেই একমাত্র আয়ুধ বলে জেনেছিলেন। এইজন্যই এই গল্প বিজ্ঞানচেতনা, ভাষাচেতনা এবং জীবনচেতনা—এই ত্রিবিধ রন্ধ্রের ল্যাবরেটরী হয়ে উঠেছে।

'ল্যাবরেটরী' গল্পের মূল থীমটা প্লটের আড়াল থেকে আবিষ্কার করা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক নন্দকিশোরকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল সোহিনী নামে একটি পাঞ্জাবী মেয়ে। সে হল তাঁর সাধনার সঙ্গী। স্বামীর অকস্মাৎ মৃত্যুর পরে তাঁর ল্যাবরেটরী রক্ষার ভার পড়ল সোহিনীর উপরে। আর তার জন্য সোহিনী সব কিছু করতে প্রস্তুত। এমন কি প্রেম করতেও রাজী। সেই প্রেমে দেহের ছোঁয়াচ লাগাতেও আপত্তি নেই তার। সোহিনী একটি ভাল ছাত্রকে খুঁজে বার করে—রেবতী ভট্টাচার্য। তাকে দিয়েই ল্যাবরেটরী চলবে ভাল। কিন্তু তাতে বাধা হয়ে দাঁড়াল দুজন। এক, সোহিনীর মেয়ে নীলা, অন্যজন রেবতীর পিসীমা, যিনি ওকে আঁচল চাপা দিয়ে রেখে দিতে চান। নীলার মোহ জড়িয়ে ধরল রেবতীকে, সোহিনী তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করল নিজের বুদ্ধি ও শক্তি। লড়াই যখন তুঙ্গে, সেই মুহূর্তে এসে দাঁড়ালেন রেবতীর পিসীমা। তাঁর এক ডাকে রেবতী ফিরে গেল

নিজের গর্তে, পিছনে পড়ে রইল তার সকল মোহের বস্তু।

এই গল্পের জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনেক নিন্দা সইতে হয়েছিল। বনফুলকে বলেছিলেন—'গালের গালিচার ওপরে বসে আছি'। সোহিনী চরিত্রটিকে পাঠক বুঝতেই পারেনি। স্বামীর কাজের প্রতি তার অনুরাগ এতই প্রবল ছিল যে তাকে রক্ষা করবার জন্য, প্রয়োজন হলে সে অপরের প্রতি দেহগত প্রেম নিবেদনেও পিছপা হয়নি। সাধারণভাবে একে বিশ্বাসভঙ্গ মনে করলেও, এইটাই তার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার নজীর। বাঙালী চরিত্রের সংকীর্ণতার জন্য এই চরিত্রের গভীরতাকে অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি। প্রেমের এই দ্রবণে বাংলাসাহিত্যের যে অনুপম ল্যাবরেটরী রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছিলেন, তাকে রক্ষা করবার মতো কোনো সোহিনীর দেখা আজো আমরা পাইনি।

রবীন্দ্রনাথের এই বিষয়বস্তু নির্বাচনের মধ্যে একটি নিরাসক্ত অথচ উৎসাহী মনোভাব দেখতে পাই আমরা। তাঁর বৈজ্ঞানিক চেতনারই প্রকাশ এটি। গল্পের পটভূমিকায় একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং কৌতূহল বিশেষভাবে প্রতিফলিত। 'ল্যাবরেটরী' গল্পটি যে গ্রন্থের অন্তর্গত, সেই 'তিনসঙ্গী'র তিনটি গল্পেই এই উপাদানটি নজরে পড়ে। তিনটিতেই রয়েছে উচ্চবিত্ত সমাজ, প্রতিষ্ঠিত চরিত্র, রুচি, সংস্কার, ফ্যাশান, আভিজাত্য ও চিন্তার উৎকর্ষ এবং মূল্যবোধের পরিবর্তন। বিজ্ঞানী মেজাজের চরিত্র রয়েছে তিনটিতেই।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ বছরগুলো পর্যালোচনা করলে কবির বিজ্ঞান চেতনার একটি পরিবেশ চোখে পড়ে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে কবির ঔৎসুক্য ছিল চিরকালই। লোকসাহিত্য গ্রন্থমালায় নানা জনকে দিয়ে বিজ্ঞানের বিষয় লিখিয়েছেন, নিজে ১৯৩৭য়ে লিখেছেন 'বিশ্বপরিচয়'। নিয়মিত পড়েছেন বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থ। ঐ সময়েই হেমন্তবালা দেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছেন—'সাহিত্যের বইয়ের চেয়ে বিজ্ঞানের বই আমি বেশী পড়ে থাকি।' ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত রচিত কাব্যেও তাঁর ঐ বৈজ্ঞানিক চেতনা প্রকাশিত। এই সময়ে প্রশান্ত মহলানবিশ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি খ্যাতিমান তরুণ বিজ্ঞানী তাঁর নিয়মিত সংস্পর্শে আসেন। বৈজ্ঞানিক জন রাসেল এই সময়েই শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। ১৯৩৫য়ে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা কবির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন।

দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞান সম্পর্কিত পরিমণ্ডল কবির চারপাশে তৈরী হয়ে ছিলই। এই ধারণাকে তিনি শুধুমাত্র পুঁথিগত পাঠ বা আলোচনায় সীমাবদ্ধ না রেখে, জীবনের মধ্যে সম্প্রসারিত করে নিয়ে গিয়েছেন। আমাদের জীবনে এখন নিশ্চিত-

ভাবে দুই ধরণের সংস্কৃতি গড়ে উঠছে। একটিকে বিজ্ঞানের দিক বলা চলে, তার মধ্যে প্রযুক্তিবিদ্যাই অবশ্য বেশী জনপ্রিয়। অপরটি মানবিক বিদ্যা, যার প্রতি আপাতত মানুষের যেন কিঞ্চিৎ অনীহা। কারণ আর কিছুই নয়, এটি কম অর্থকরী। ফলে সমাজ ভারসাম্য হারাচ্ছে, দুটি সংস্কৃতির মধ্যে যেন একটি অলক্ষ্য রেষারেষি লক্ষ্য করা যায়। যাঁরা সাহিত্য বা মানবিক বিদ্যার পথের পথিক, তাঁরা অপরপক্ষকে সংস্কৃতিবান মনে করেন না। যাঁরা বিজ্ঞান নিয়ে পড়েন বা কাজ করেন, তাঁরা আবার এই পক্ষকে কিঞ্চিৎ কৃপার চক্ষে দেখেন।

রবীন্দ্রনাথের হাতে এই দুই দিকের সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি প্রকৃতির মধ্যে মানুষকে নাচে, গানে, সাহিত্যে আনন্দিত হতে দিচ্ছিলেন, আবার সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে জীবনে প্রোথিত করে দিতে চাইছিলেন। 'ল্যাবরেটরী' গল্পে তাঁর সেই জীবনবোধ মহিমাময় হয়ে উঠেছে। জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতায় তিনি জেনেছিলেন ভালবাসার দীপ্তি, এবং সেই বিষয়েই পরীক্ষানিরীক্ষা চালাবার জন্য গড়ে তুলেছেন ল্যাবরেটরী—বেছে নিয়েছেন এমন দৃঢ়চেতা মেয়েকে যে বাঙালী নয়—'পাঞ্জাবের মেয়ে, হাতে ছুরি খেলে সহজে।' নিজে বাঙালী হলেও, বাঙালী চরিত্রের সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা তাঁর কাছে সেইভাবেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল, যেমনভাবে বিজ্ঞানীর কাছে কোন এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল অর্থবহ হয়ে ওঠে। অন্য এক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একথা স্বীকার করেছেন যে বাঙালী শুধু কাঁদুনি গাইতেই জানে, কিছু করতে পারে না। এই গল্পের পিসীমাকে দেখলেই বোঝা যায় যে বাঙালী মেয়ের সংকীর্ণতা কতটা মারাত্মক।

জীবন চিরদিন থাকে না বলেই তার প্রতি মানুষের এত লোভ। এইজন্যই তার এত চেষ্টা কোন কীর্তি স্থাপনের—'মানুষ প্রাণপণে প্রাণ বাঁচাতে চায়, কিন্তু প্রাণ তো বাঁচে না। সেইজন্য বাঁচবার শখ মেটাবার জন্য এমনি কিছুকে সে খুঁজে বেড়ায় যা প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি। সেই দুর্লভ জিনিষকে তিনি পেয়েছেন তাঁর এই ল্যাবরেটরীতে।' অর্থাৎ প্রাণের চেয়ে বড়ো কিছুকে খুঁজে পেতে হবে এই জীবনে, তবেই এই ভঙ্গুর জীবনের সার্থকতা। সেই বড়ো কিছুর আধার হল দুর্ধর্ষ, দুর্বার প্রেম।

'চোখের বালি'তে বিনোদিনী তার সমস্ত সম্ভাবনা সত্ত্বেও পূর্ণতায় পৌঁছতে পারেনি। 'চতুরঙ্গে' দামিনী ছুটে বেড়িয়েছে কস্তুরী মৃগের মতো। যে গোপন গন্ধ তাকে তাড়িয়ে ফিরেছে সারা জীবন, তার পরিচয় পেতে গিয়ে তার জীবন সারা হয়ে গেছে। সেই মুহূর্তে সে জন্মান্তর কামনা করে সাধ মেটাতে চেয়েছে।

'ল্যাবরেটরী' গল্পে সোহিনী এদের থেকে অনেক পরিণত, প্রেমের জন্য তাকে আর হাহাকার করতে হয় না। প্রেমপাত্রের কীর্তিকে স্থায়ী করে রাখাই এখন তার দায়িত্ব। 'বলাকা'তে রবীন্দ্রনাথ সম্মুখপানে চালাতে পারে না যে প্রেম, তাকে ধুলোয় ফিরিয়ে দিয়েছেন। 'চিত্রাঙ্গদা'র নায়িকা শুধু রজনীর নর্মসহচরী নয়, দিবসের কর্মসহচরীও বটে। এই সমস্ত কাব্যে যা বলেছিলেন, 'ল্যাবরেটরী' গল্পে তাকে বাস্তব চেহারা দিতে বসলেন রবীন্দ্রনাথ। এটা যে ঘটে এমন নয়, তবে এইরকমই ঘটা উচিত ছিল।

কিন্তু শুধু এই-ই নয়। বাঙালী জীবনে যে বিফলতা আছে, রবীন্দ্রনাথ তাকেও ধিক্কার দিতে ছাড়েন নি। রেবতী বিদ্বান, কিন্তু ব্যক্তিত্বহীন। সোহিনীর অনুপস্থিতিতে তার মেয়ে নীলার আকর্ষণে সে ধরা দেয়—নিজের কাজের ক্ষতি করে—কিন্তু প্রথমতম বাধা এলেই গুটিয়ে যেতে দ্বিধা করে না। জীবনে যে প্রবল মাতৃতন্ত্র দুর্বল বাঙালীকে মানুষ হতে দেয়নি, তার প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ এ গল্পের দাঁড়ি টেনেছেন। এই যবনিকা উত্তোলন করা সম্ভব কিনা, কয়েক কোটি মানুষকে বিধাতা আজো শুধু বাঙালী করেই রাখবেন কিনা, তার জবাব দিতে হবে রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালকে। অবশ্যই সে হবে আরেক গল্প। ল্যাবরেটরীর পরীক্ষা জীবনের ব্যবসায়ে কাজে লাগবে কিনা সেই গল্পে তাই দেখাতে হবে। 'ল্যাবরেটরী'র পরে সেইটিই হবে প্রথম আধুনিক কাহিনী। পিসিমার নিষেধ ও নীলার অন্তর্ঘাত ছাড়িয়ে সোহিনীর আদর্শকে কোনো রেবতী গ্রহণ করতে পারলে বাঙালীর নবজন্ম ঘটবে।

'ল্যাবরেটরী' গল্পে রবীন্দ্রনাথের ভাষাও চকিত হয়ে লক্ষ্য করবার মতো। তাঁর প্রথম এবং শেষ জীবনের ভাষার দিকে তাকালে ধরা পড়ে যে দুটোই বাংলা হলেও, দুটো এক নয়। প্রকাশক্ষমতায়, শব্দনির্বাচনে, বাক্যগঠনে, বাগ্‌ভঙ্গিমায় এ ভাষার পরিণতি বিস্ময়কর।

যে বছর 'চতুরঙ্গ' লেখা হয়েছিল, সেই বছরই লেখা হয়েছিল 'ঘরে বাইরে'। 'চতুরঙ্গ' সাধুভাষায় লেখা হলেও তাতে চলতিভাষার স্বাদ এসে পৌঁছে গিয়েছিল—'ঘরে বাইরে'তে ঐ ইতঃস্ততভাবটুকুও কেটে গেল। সরাসরি চলতি ভাষায় লেখা সুরু হল। ১৯১৬ থেকে ১৯৪০—এই দীর্ঘ ২৪ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চলতি-ভাষার নানা পরিবর্তন ঘটেছে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের একটু উদ্ধৃতি দিলে কবির উপন্যাসে চলতিভাষার প্রথম রূপটা কেমন ছিল দেখা যাবে—নিখিলেশের

একটি সংলাপের অংশ তুলে দিচ্ছি—

'আজকাল য়ুরোপ মানুষের সব জিনিষকেই বিজ্ঞানের তরফ থেকে যাচাই করছে ; এমনিভাবে আলোচনা চলছে যেন মানুষ পদার্থটা কেবলমাত্র দেহতত্ত্ব কিম্বা জীবতত্ত্ব কিংবা মনস্তত্ত্ব কিংবা বড়ো জোর সমাজতত্ত্ব। কিন্তু মানুষ যে তত্ত্ব নয়, মানুষ যে সব তত্ত্বকে নিয়ে সব তত্ত্বকে ছাড়িয়ে অসীমের দিকে আপনাকে মেলে দিচ্ছে, সে কথা ভুলো না।'

এই চলতিভাষার মধ্যে কিঞ্চিৎ বই-বই গন্ধ রয়ে গেছে। 'অসীমের দিকে মেলে দিচ্ছে'—এই অংশটা ঠিক মুখের কথার মতো মনে হয় না। একটু কাব্যিক বলা চলে। চলতিভাষা হলেও এর মধ্যে যে ধরনের বাক্য আছে, তার অনেকটা মানুষ মুখে কখনো বলে না। যদিও এর লাবণ্য সংশয়াতীত, তবুও এর যে উন্নতি, যে সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল, তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনাগুলোতে বিকশিত হতে লাগল। 'ল্যাবরেটরী' গল্পে—বা 'তিনসঙ্গী' গ্রন্থে—এই চলতি ভাষা একেবারে মুখের ভাষা হয়ে উঠল। প্রকরণের দিক থেকে চিন্তা করলে মুখের ভাষা এবং চলতি গদ্য যা লেখা হতো, তাতে হয়তো তফাৎ নেই, গঠনভঙ্গী হয়তো একইরকম, তবু দুটোর মধ্যে অমিলও অনেক। ক্রিয়াপদের চেহারাতেই সাধু এবং চলতি ভাষার প্রধান প্রভেদ ধরা পড়ে একথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলা ভাষা পরিচয়ে' লিখেছিলেন। এতে চলতি গদ্যের যে নমুনা ছিল, সেটা দেখা যাক—'কুঞ্জবাবু চললেন মধুরায়। তাঁর ভাই মুকুন্দ যাবে স্টেশন পর্যন্ত।...ঐ বুঝি দেখা গেল সিগন্যাল ডাউন। ওদিকে নামল বৃষ্টি, তার সঙ্গে জোর হাওয়া।...গোলেমালে কোথায় মেয়েটি পালালো, সন্ধানে ছুটল লোকজন।' একেবারে ঘরোয়া বর্ণনা। তবু 'সন্ধানে' শব্দটা বদ্‌লে 'খোঁজ করতে' বসানো যায়।

ক্রিয়াপদের সঙ্গে সর্বনামের চেহারাটাও চলতি ভাষাতে পরিবর্তিত হয়। তবুও মুখের কথার সঙ্গে তার তফাৎ থেকেই যায়। তার কারণ, এই চলতি ভাষার মধ্যে এমন একটি সচেষ্ট নির্মাণকলা রয়েছে যা ভাষাকে সৌন্দর্য দান করে। মুখের কথার মধ্যে ঐ কৌশল ব্যবহারের সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ—যদিও কারো কারো বচনও অনির্বচনীয় হয়ে উঠতে পারে। এই মুখের কথার যাদুই রবীন্দ্রনাথের হাতে তাঁর শেষজীবনের রচনায় মূর্ত হয়ে উঠল। তাঁর শেষ দশকের কাব্য বিচার করলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে যেন কোনো কৌশলই নেই। যা মুখে মুখে বলতেন, তাই যেন লিখে চলেছেন কবি। ১৯৩৩ সালে লিখলেন 'চণ্ডালিকা' গীতিনাট্য। তাতে একেবারে মুখের কথা ব্যবহার করলেন। সেই মুখের কথারও রকমফের ঘটল

চরিত্রগুলোর ভাবনার স্তর অনুযায়ী। প্রকৃতির মা বলছে—

কখন বা চুলো তুই ধরাবি
কখন ছাগল চরাবি।

প্রকৃতি উত্তরে বলছে—

কাজ নেই, কাজ নেই মা, কাজ নেই মোর ঘর কন্নায়
যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে সব বন্যায়।

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষায় রোজকার কথা বলাকেই কাজে লাগাতে চেয়েছেন। প্রকৃতির মায়ের মুখে রোজকার কাজের কথা, প্রকৃতির চিন্তাটা আরেকটু উচ্চস্তরের বলে তার কথায় রোজকার ভাষা, কিন্তু তাতে নিত্যকালের দ্যোতনা।

'ল্যাবরেটরী' গল্পে সেই চেষ্টা একেবারে ফুল ফুটিয়ে তুলল। 'ঘরে বাইরে' থেকে যে উদাহরণ আমরা আগে দেখেছি, সে ধরনের পংক্তি এতে একেবারেই নেই। চরিত্রদের সংলাপ ছাড়া তাদের চিন্তার কথা কোথাও আলাদা করে বর্ণনার চেষ্টা হয়নি। ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, কখনো বা অল্পকথায় কোনো বিবরণ দেওয়া হয়েছে, জুড়ে দেওয়া হয়েছে দু'একটা খুচরো মন্তব্য! তার মধ্য থেকেই চরিত্রগুলোর বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে। সংলাপ খুবই কাটা কাটা, কোথাও ভাবালুতা প্রশ্রয় পায়নি। উপমাও বৈজ্ঞানিক, ফলে নৈর্ব্যক্তিক, দু'একটা উদাহরণ দেওয়া চলে—

মেয়েটি বললে 'আমার জন্মস্থানে শয়তানের দৃষ্টি আছে।' নন্দকিশোর বললে, 'বল কি! শয়তানের? মেয়েটি বললে, জানো তো বাবুজী, জগতে সবচেয়ে বড়ো নাম হচ্ছে ঐ শয়তানের। তাকে যে নিন্দে করে করুক, কিন্তু সে খুব খাঁটি। আমাদের বাবা বোম্ ভোলানাথ ভোঁ হয়ে থাকেন। তাঁর কর্ম নয় সংসার চালানো। দেখো না, সরকার বাহাদুর শয়তানির জোরে দুনিয়া জিতে নিয়েছে, গুষ্টানির জোরে নয়। কিন্তু ওরা খাঁটি তাই রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছে...'

ভাষার মধ্যে পুরোপুরি মুখোমুখি কথা বলার ছাপ। বিষয়ও খুব স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ। শয়তানের উপমা দিয়ে বৃটিশ রাজত্বের প্রতি ইঙ্গিতটি খুবই অর্থপূর্ণ। বাঁচার লড়াইয়ে জেতার রকমটা এমন করে বলতে চাওয়ার জন্য কথ্যভঙ্গীতে আনা হয়েছে দ্রুততা। আর একটা উদাহরণ—

রাত কাপড়ের ভিতর থেকে নীলার নিখুঁত দেহের গঠন ভাস্করের মূর্তির মতো

অপরূপ হয়ে ফুটে উঠল···এমন আশ্চর্য সৌন্দর্য সে কল্পনা করতে পারে না।

বর্ণনাটিতে যৌনতার গন্ধ আছে, কিন্তু ভাষার জোরে তা থেকে গড়ে উঠেছে শিল্প। ভাষার মধ্যে কোথাও কোন জবরদস্তি নেই, নেই কোন অপ্রয়োজনীয় অংশ।

আর একটা টুকরো—

'···পিসিমার আঁচল ওকে আগলে আছে, সে আঁচল ননকম্‌বাস্টিবল।'

রেবতীর মেয়েলি মুখ লাল হয়ে উঠছিল। সোহিনী, আমি তোমাকে জিগ্‌গেসা করতে যাচ্ছিলুম, আজ সকালে তুমি কি ওকে আফিম খাইয়ে দিয়েছিলে'

'জিগ্‌গেসা' শব্দটি ছাপার অক্ষরে পরিত্যজ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ একে ব্যবহার করেছেন দ্বিধাহীনভাবে—গল্পের একাধিক স্থানে। কথ্যভঙ্গীর আবহ তৈরী হয়েছে এতে।

এবারে একটি উচ্চবিত্ত সমাজের বর্ণনা—উচ্ছৃঙ্খলতা রয়েছে, রয়েছে দুর্বল নায়কের মনোভাবের ছবি—

মাঝে মাঝে রেবতীকে ঈর্ষায় কামড়ে ধরে। ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরের মুখের চুরট থেকে নীলা চুরট ধরায়। একে নকল করা রেবতীর অসাধ্য। চুরটের ধোঁয়া গলায় গেলে ওর মাথা ঘুরে পড়ে, কিন্তু এই দৃশ্যটা ওর শরীর মনকে আরও অসুস্থ করে তোলে।

ভাষাটাতেই একটা ছটফটানি আছে। 'কামড়ে ধরে'—এই ব্যবহারে রেবতীর মনের যন্ত্রণাটা বোঝা যায়।

গল্প যখন তুঙ্গে, ল্যাবরেটরীর আহ্বান ভুলে রেবতী নীলার মোহে প্রায় ধরা দিতে চলেছে যখন, তখন নিয়তি এসে দাঁড়াল তার পিছনে। বাঙালী যুবকের দম্ভ ঘুচে গেল—

হঠাৎ একটা ছায়া পড়ল দেয়ালে। পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'রেধি, চলে আয়।'

সুড় সুড় করে রেবতী পিসিমার পিছন পিছন চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না।

হঠাৎ, একেবারেই হঠাৎ, তিনচারটি বাক্যে গল্পের উপসংহার টেনে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। সুড় সুড় করে—এই শব্দ তিনটিতেই রেবতীর মেরুদণ্ডহীনতা প্রকাশ পেল, আলাদা কোনো সাজানো কথার দরকারই হল না।

বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সূচনা ও রবীন্দ্রনাথ
প্রসঙ্গ : "বিশ্বপরিচয়"

বাসুদেব মাইতি

"বিশ্ব-পরিচয়"-এ রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশ্বের পরিচয় দেননি, দিয়েছেন তাঁর নিজের পরিচয়ও। সে-পরিচয় তাঁর বৈজ্ঞানিক সত্তার। বিশ্বের বিপুল গহন রহস্যের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি তাঁর কবি-সত্তার অন্তরালে লুকানো বৈজ্ঞানিক সত্তার করেছেন প্রকাশ।

তিনি মূলতঃ কবি এবং কবিরূপেই তাঁর খ্যাতি। তিনি নিজেও তাঁর কবি-পরিচয়ে গৌরব বোধ করতেন। তথাপি ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে এই গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ কবির সর্বব্যাপী প্রতিভার এক অভিনব এবং বিপরীত দিক দেশবাসীর কাছে উদ্‌ভাসিত হল।

কিন্তু কোন্ প্রেরণা থেকে এই বিজ্ঞান সাধনা? কেন তিনি এই সাধনায় নামলেন?

গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি তাঁর এক দীর্ঘ জবাব-দিহি দিয়েছেন, "শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে—তাতে অগৌরব নেই। সেই দায়িত্ব নিয়েই আমি এ কাজ শুরু করেছি।' "ছাত্র পাঠকের প্রতি" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "তোমাদের জন্যে বিশ্ব পরিচয় বইখানা লিখেছিলুম···। জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শখ ছিল বলেই বেঁচে গেছি, বিশেষ সাধনা না থাকলেও। সেই শখটা তোমাদের মনে যদি জাগাতে পারি, তাহলে আমার যতটুকু শক্তি সেই

অনুসারে ফল পাওয়া গেল মনে করে আশ্বস্ত হব।"

তরুণ শিক্ষার্থীদের অন্তরে বিজ্ঞানের প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য থেকে তিনি যে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন, তাতেও তিনি বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। এই বিষয়বস্তু নির্বাচনের পশ্চাদ্‌পটে একটা যৌক্তিক সঙ্গতিও রয়েছে।

মহাবিশ্বের রহস্য ও তার সৃষ্টির রূপবৈচিত্র্য কবির কল্পনাপ্রবণ সৃজনশীল অন্তর্লোকে বিস্ময় সৃষ্টি করত, তাঁর চিত্তকে আলোড়িত করত। তাই শিক্ষারম্ভের গোড়াতেই তাঁর বিজ্ঞান শিক্ষার দিকে ঝোঁক যায়। সীতানাথ ঘোষ মহাশয় বিজ্ঞানের অতি সাধারণ দু'একটি তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতেন, তিনি অবাক হয়ে যেতেন।

মহাবিশ্ব কিশোর কবিকে মুগ্ধ করত, তাই বিজ্ঞানশিক্ষার শুরুতে জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর ঝোঁক যায়, "জীবন-স্মৃতি"র "হিমালয় যাত্রা" পরিচ্ছদে তিনি বলেছেন, "সন্ধ্যা হইয়া আসিলে পর্বতের স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি আশ্চর্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত এবং পিতা আমাকে গ্রহতারকা চিনাইয়া দিয়া জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।" জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়া তাঁর ঝোঁক প্রাণীবিজ্ঞানেও যায়। সেই অল্পবয়সে বিজ্ঞানের এই দুই শাখায় নানা ইংরাজি গ্রন্থ তিনি পাঠ করেছেন। ফলে তাঁর মনের একটা "বৈজ্ঞানিক মেজাজ" স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।

"বিশ্ব-পরিচয়" পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত হলেও গ্রন্থের ভূমিকা এবং উপসংহারটিকে আরও দুটি অধ্যায়রূপে অভিহিত করা যেতে পারে। প্রথম অধ্যায় "পরমাণুলোক"-এ পরমাণুসমূহের কার্যকারণ পরম্পরার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় "নক্ষত্রলোক"-এ কবি মহাবিশ্বের নক্ষত্রমণ্ডলের সৃষ্টি, পরস্পরের অবস্থান, গতি প্রকৃতির আলোচনা করেছেন। "সৌরজগৎ" শীর্ষক অধ্যায়ে সূর্য থেকে গ্রহগুলির উৎপত্তির বিবরণ, সূর্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, সূর্যের উপাদান, তার আবর্তন, তার আলোর বিকিরণ, তার সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। "গ্রহলোক" অধ্যায়ে সূর্যের সঙ্গে তার পরিবারের গ্রহ-উপগ্রহের সম্পর্কের আলোচনা করা হয়েছে। "ভূলোক" শীর্ষক অধ্যায়ে পৃথিবীর শৈশবকালের আলোড়ন, তার অভ্যন্তরস্থ গঠনপ্রকৃতি, তার বায়ুমণ্ডল, পৃথিবীতে প্রাণলোকের এবং মনোলোকের সৃষ্টি এবং চাঁদ ও তার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। "উপসংহার" শীর্ষক অংশে কবি এক অপরূপ রোমান্টিক গীতি কবিতার সুরে এক অভিনব প্রশ্নের অবতারণা করেছেন—"মহাবিশ্বের জড়জগতে যা ঘটছে, কালের ও আয়তনের (ক্ষুদ্র ও বৃহৎ) প্রচণ্ডতায় যতো বড়ই আশ্চর্য হোক, সকলের বড়ো

আশ্চর্য মানুষ তাদের জানছে, মানুষের মন তাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব রাখছে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তার দেহ, বিশ্ব-ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে সে বর্তমান, বিরাট বিশ্বসংস্থিতির অণুমাত্র স্থানে তার অবস্থান; কিন্তু অসীমের সব খবরই সে জানছে। এই জানার পিছনে মনের ভূমিকা কোথায়!···জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ হয় সৃষ্টির শেষ পরিণাম।"

কিন্তু "বিশ্ব-পরিচয়" গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য কি?

ঐ গ্রন্থের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য—বিজ্ঞান এখানে সাহিত্য হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের দুরূহ অরণ্য সাহিত্যের নন্দনকাননে শোভিত হয়েছে।

কবি বিজ্ঞানের কঠিন বিষয়বস্তুকে সাহিত্যের রম্য দরবারে উপনীত করেছেন। তাঁর বাসনা ছিল পাঁচটি বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু নিয়ে একটি যথার্থ সাহিত্য-গ্রন্থ রচনা করা। রাজনীতি শিক্ষা ধর্ম সমাজ প্রভৃতি বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি যেমন সাহিত্যমূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন, তেমনি বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে এই বিজ্ঞানবিষয়ক সাহিত্য-গ্রন্থ রচনা করেছেন।

গ্রন্থটিকে বিজ্ঞানবিষয়ক সাহিত্য-গ্রন্থ বলা হল বটে, কিন্তু তার সে সাহিত্য-গুণ কোথায়? গুণ হল তার ভাষা। কবির নিজের ভাষায় "এর (পুস্তকটির) নৌকাটা অর্থাৎ এর ভাষাটা যাতে সহজে চলে সে চেষ্টা এতে আছে।" যথার্থই এর ভাষাটি সহজ এবং তর তর করে এগিয়ে চলেছে। চলতি ভাষায় স্বচ্ছন্দ গতিতে বইটি ভারি সুখপাঠ্য হয়েছে। প্রকাশের ভঙ্গিটি, বলার ধরণটি কাব্যিক, অনেক স্থলে রোমান্টিক গীতিধর্মী, কবিতা যেন গদ্যে রূপ নিয়েছে। যেমন, "সূর্য আমাদের চারদিকে আলোর পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে," "আলো মারে চোখে, গরম মারে গায়ে।" এ ধরণের পংক্তি পুস্তকটির নানা স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। "নক্ষত্রলোক" এবং "ভূলোক" অধ্যায়-দুটির শেষ অনুচ্ছেদদ্বয়ে এবং "উপসংহার" অধ্যায়ের প্রায় সবটাতেই রোমান্টিক গীতিকাব্যের সুর অনুরণিত হয়েছে।

পুস্তকটির ভাষায় অলঙ্কার প্রয়োগ এবং তার প্রয়োগের কৌশলটি লক্ষনীয়। সৃষ্টিমূলক সাহিত্যে অর্থাৎ গল্প-উপন্যাসে যে ধরণের উপমা উৎপ্রেক্ষা অনুপ্রাস প্রভৃতি অলংকার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, এ গ্রন্থের বাক্য বা বাক্যাংশে তার প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, "বিষুবরেখার কটিবেষ্টন" "আলো-নকিব", "সাতরঙের রশ্মির পেখম," "সংখ্যার ফৌজ লম্বা লাইন," "চাঁদ তালপাকানো

মরুভূমি," "চাঁদ যখন শনিগ্রহের নকল করতে থাকবে, তখন হবে তার শনির দশা।" গল্প-উপন্যাসে লেখক অলঙ্কার প্রয়োগে বক্তব্য বিষয়কে সরল সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য করেন। কবিও সে উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞানবিষয়ক সাহিত্য-গ্রন্থে অলংকারের বহুল প্রয়োগ করেছেন এবং তাঁর সে প্রয়াস সফল ও সার্থক হয়েছে।

বইটি পড়ার সময় মনে হয় কবি যেন গল্প বলে চলেছেন, অর্থাৎ গল্প বলার টেকনিকে তিনি তাঁর চক্তব্য বিষয়কে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন। সেই সঙ্গে মাঝে মাছে গল্পচ্ছলে দৃষ্টান্তও দিয়ে চলেছেন। যেমন, সূর্যের প্রচণ্ড তাপ আমরা অনুভব করি; কিন্তু মহাবিশ্বের কোটি কোটি নক্ষত্রের ভয়াবহ প্রচণ্ড উত্তাপের লেশমাত্র আমরা পাইনা। কারন, মহাবিশ্বের মহাকাশে তা খরচ হয়ে যাচ্ছে। তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে কবি বলেছেন," বড়ো যজ্ঞের রান্নাঘরে যে চুল্লি জলছে তার কাছে বসা আরামের নয়; কিন্তু বেলা দশটার কাছাকাছি শহরের সমস্ত রান্নাঘরে যে আগুন জলে বড়ো আকাশে তা ছড়িয়ে যায় বলেই শহরে বাস করতে পারি।" যৌগিক পদার্থ ও মৌলিক পদার্থের উদাহরণ দিতে গিয়ে, দুরন্ত চঞ্চল হ্যাঁ-ধর্মী অতি পরমাণুদের পরস্পরের মিলিত সংযত ভাবটিকে বোঝাতে গিয়ে, পরমাণুকেন্দ্রবাসী অতিপ্রবল আকর্ষণ শক্তির ক্ষমতা বোঝাতে গিয়ে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা বলতে গিয়ে এমনি সরস সুখপাঠ্য গল্পের অবতারণা করেছেন।

আবার কোথাও কোথাও লঘু কৌতুকের অবতারণা করেছেন। যেমন, মানুষের শরীরের মধ্যে দিয়ে দৈহিক ঘটনা অনুভূতিতে পৌঁছয় সেকেণ্ডে প্রায় একশো ফুট বেগে, এটা বোঝাতে গিয়ে কবি পৃথিবীতে যে দৈত্যের আমদানী করেছেন, সেই দৈত্যের হাত যদি দৈবাৎ সূর্যের গায়ে লেগে পুড়ে যায়, সেটা দৈত্যের অনুভূতিতে পৌঁছতে সময় লাগবে একশ ষাট বছর। আর "তার আগেই সে যদি মারা যায় তো জানবেই না।" দূরের গ্রহগুলির সূর্যপ্রদক্ষিণের পালা দীর্ঘদিন, "এতদিন বেঁচে থাকতে হলে মানুষের পরমায়ুর বহর বাড়াতে হবে।"

অর্থাৎ সহজ এবং স্বচ্ছন্দ গতিশীল ভাষা এবং তার কাব্যিক ও রোমান্টিক-ধর্মিতা, তাতে সুষ্ঠ অলংকার প্রয়োগ এবং গাল্পিক টেকনিক গ্রন্থটিকে সাহিত্যের আম-দরবারে আসীন করেছে।

তবে পুস্তকটি যে শুধু সাহিত্য-গ্রন্থ হয়েছে, এ-কথা মনে করলে আবার ভুল হবে। মনে রাখতে হবে বইটি আসলে বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ এবং সেইজন্য অন্যান্য

প্রবন্ধ-গ্রন্থ রচনার তুলনায় এ-গ্রন্থ রচনায় কবিকে অনেক বেশি হুঁসিয়ার হয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। সমাজ, রাজনীতি ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতি আলোচ্য গ্রন্থে বিষয়ের এবং তা প্রকাশের এদিক-ওদিক হলে তাতে বিশেষ কিছু ইতর-বিশেষ হয় না। কিন্তু তথ্যের যাথার্থে এবং সেটাকে প্রকাশ করার যাথাযার্থ্যে বিজ্ঞান অল্পমাত্রও স্খলন ক্ষমা করে না।" (গ্রন্থের ভূমিকা)।

এই গ্রন্থে কবির আর একটি বিশেষ ক্ষমতারও পরিচয় পাওয়া যায়। বিজ্ঞানবিষয়ক ইংরাজি শব্দের বাংলা পরিভাষা তৈরি করা। যেমন, বিদ্যুত (ইলেকট্রিসিটি), হ্যাঁ-ধর্মী না-ধর্মী বিদ্যুত (পজিটিভ নেগেটিভ ইলেকট্রিসিটি), ভারবর্তন (গ্রাভিটেশন) স্তরান্তর (স্ট্রাটোস্ফিয়ার), ক্ষুব্ধস্তর (ট্রোপোস্ফিয়ার), কিরীটিকা (করোনা), মহাজাগতিক রশ্মি (কস্মিক রে), ক-রশ্মি (আল্ফা রে), খ-রশ্মি (বীটা রে), আকাশবানী (রেডিও), আলো-চলা-বছর, তেজের কাপন, তেজ-ছিটানো-বেগনী-পারের আলো, লাল-উজানি আলো—ইত্যাদি।

এই পুস্তকখানি কবির পঠন-পিপাসার, জ্ঞানান্বেষণ-স্পৃহার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। দীর্ঘজীবনব্যাপী কবি শুধু বহু গ্রন্থ রচনা করেন নি, প্রচুর বিজ্ঞান পুস্তকও পাঠ করেছেন।

ব্যক্তিগত রচনা

গুণানন্দর আশা

গুণানন্দ ঠাকুর

সম্পাদক সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত বড়ই পীড়া দিতেছে, তাহার আবদার আবার লেখনী ধরিতে হইবে। বৃদ্ধ মনুষ্যের সমস্তই গিয়াছে। খাদ্যে সুখ নাই। তাহা এক প্রকার সুখের। অগ্রে যে মূল্যে একটি তালুক কিনা যাইত এখন মৎস্য কিনিতে প্রায় সেই মূল্যই দিতে হয়। ব্রাহ্মণীকে প্রবোধ দিয়াছি শীঘ্রই মৎস্য নির্য্যাস ক্রয়ার্থে বাজারে আসিবে। তখন তিস্তিরী-পত্রের ঝোলে উহা মিশাইয়া লইলেই এয়োতীর কাজ চলিবে। যতদিন এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জীবিত আছে তখন লক্ষণের কি প্রয়োজন। ইহার উপর আবার শরীরের ব্যাধি তো রহিয়াছেই। আজি বাতব্যথা, কল্য শূলবেদনা, বৃদ্ধের বড় কষ্ট। তবু শ্রীমান সমরেন্দ্রকে ঠেলিতে পারিতেছি না। তাই কম্পিত হস্তে শিথিল শরীরে গুণানন্দ আবার লেখনী তুলিয়া লইয়াছে! ভাল লাগিলে কৃতিত্ব গুণানন্দের। আর যদি খারাপ হইয়া থাকে তাহা হইলে সে দোষ সমরেন্দ্র বাবাজীর।

জনান্তিকে একটি কথা বলিয়া রাখি আজকাল লিখিতে ইচ্ছা হয় না। হে পাঠক বুঝিও বৃদ্ধ যখন কথা কহিবার সুযোগ পাইয়াও কথা কহিতে চাহিতেছে না, তখন বিষম কিছু গোল বাধিয়াছে। বৃদ্ধের কাছে কেহ সহজে ঘেঁষিতে চাহে না। পুরাতন দিনের বৃত্তান্ত কেইবা শুনিতে উৎসুক? তবু কেন গুণানন্দ অপারগ? আসল ঘটনা হইল গুণানন্দ ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিয়া কিছুটা ভীত।

রাজীব বাবাজীবন যেক্ষণে দেশের ভার লইয়াছিল বুড়া গুণানন্দ আনন্দিত

হইয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল দেশ স্বাধীন করিবার মন্ত্রে যাহারা দীক্ষিত ছিল তাহারা স্বার্থত্যাগী ছিলেন সত্য কিন্তু কিছুটা কাণ্ডজ্ঞানহীন ছিলেন সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। বস্তুত তাঁহাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যই ছিল ব্রিটিশ সরকারকে যেন তেন প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করা। এই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে তাঁহারা কতজন যে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন তাহার কোন হিসাব নাই। বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে আসিয়া তাঁহারা তাম্রফলক পাইবেন এই জন্য তাঁহারা দেশসেবা করেন নাই। কিন্তু দেশ স্বাধীন হইবার পর দেখিলাম সেই স্বাধীনতাসংগ্রামীদের হয় দূরদর্শিতা নাই, নহিলে তাঁহাদের মধ্যে বহুজনই ক্ষুদ্র লোভের নিকট নতিস্বীকার করিতেছেন। গুণানন্দ ভাবিয়াছিল নূতন প্রজন্মের নূতন ভাবধারা দেশে আসিবে।

গুণানন্দ আজ হতাশ। সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে ভারতবর্ষ চিরকাল একটি অদ্ভুত পন্থা গ্রহণ করিয়াছে। গুণানন্দ মনে করে যে ভারতবর্ষ একটি আধুনিক দেশ হইবে। তাহার মনে আছে সংবিধান যখন তৈয়ারী হইতেছিল তখন দেশবাসী কিরূপ উদ্দীপিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ একটি আদর্শ সংবিধান রচনা করিয়াছে। নূতন সূর্য দেখা দিয়াছে। ভারতবাসী মাত্রেই একটি নিয়মের অধীন রহিবেন ইহাই ছিল আশা। তখন সে ভাবিয়াছিল সংরক্ষণ সম্বন্ধে যাহা ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা কালক্রমে অন্তর্হিত হইবে। দেশ একটি নিয়মেরই নিগড়ে চলিবে। গুণানন্দ বড় ভুল করিয়াছিল। সংরক্ষণ করিয়া অনুন্নত সমাজের মুষ্টিমেয়ের সুবিধা হইয়াছে। পিতা অনুন্নত সমাজের বলিয়া আই এ এস হইয়াছিল। সেইসব পিতার পুত্ররাও আজি আই এ এস হইতে চলিয়াছে একইভাবে সেই সংরক্ষণের সুবিধা লইয়া। এইভাবে চলিতে থাকিলে কয়েকটি পরিবার মাত্র সুবিধাভোগী হইবে। কেহ শুধুমাত্র জন্মসূত্রে অনুন্নত হয় না। অনুন্নত সম্প্রদায় নিশ্চয় সাহায্যের প্রসারিত হস্ত পাইবে। কিন্তু ধন সম্পত্তিও রহিবে আবার অনুন্নত বলিয়া সুবিধাও পাইবে এরূপ হওয়া তো উচিত নহে। তাহাতে সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। এই কথা ভুলিলে চলিবে না।

রাজীব বাবাজীবন মুসলিম মহিলাদের সম্বন্ধে যে আইন প্রণয়ন করিলেন তাহার কয়েকটি বিষয় গুণানন্দকে বিশেষ উদ্বিগ্ন করিয়াছে। প্রথম কথা বাবাজীবন বিষয়টিকে তাঁহার ব্যক্তিগত সম্মানের সঙ্গে জড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহা অতি পরিতাপের বিষয়। দেশের মঙ্গল লইয়া যথায় প্রশ্ন, তথায় ব্যক্তিগত সম্মান কখনোই বড় হইতে পারে না। আজ আইন এমন ভাবে বদলানো হইল যাহাতে

ভারতবাসীদের একাংশ ভারতীয় দণ্ডবিধির একটি ধারাকে মানিবে কি মানিবে না তাহা তাহাদের খুশীর ওপর নির্ভর করিবে। ইহা এক আশ্চর্য সিদ্ধান্ত।

এই প্রসঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে দুচারিটি স্পষ্ট কথা কহিবার প্রয়োজন আছে। সাম্প্রদায়িকতা একটি পাপ। ইহা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সম্বন্ধে যেরূপ সত্য, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধেও সেইরূপ সত্য। এ প্রসঙ্গে গুপানন্দ দেখিয়াছে যে কী হিন্দু কী মুসলমান কী খ্রীষ্টান সকলেই ধর্ম বলিতে তাহার নিজের যাহাতে সুবিধা তাহাকেই বুঝইতে চাহে। যে হিন্দু বর্ণাশ্রম ধর্ম মানে না তাহাকে প্রগতিশীল বলা যাইতে পারে কিন্তু সে হিন্দু নহে! মুসলমান সম্বন্ধেও ওই একই কথা। তাহাকে কোরাণ পরিপূর্ণ মানিতে হইবে। কোরাণের বহু জিনিষ আজ ভারতবর্ষে অচল। যেমন ক্রীতদাস প্রথা। কোরাণে বার বার ক্রীতদাসদের উল্লেখ রহিয়াছে। গুপানন্দ নিশ্চয় চাহে যে মুসলমানগণ সুখে স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে বাস করুক। কিন্তু ভারতবর্ষের আইন মানিয়াই তাহাকে বাস করিতে হইবে। ক্রীতদাস প্রথার ব্যাপারে যদি মুসলমানগণ স্বীকার করিয়া লহেন যে আইন করিয়া তাহা বন্ধ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তো স্বীকার করাই হইতেছে যে দেশের সরকারের ক্ষমতা রহিয়াছে ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করিবার। সেক্ষেত্রে সীমারেখা কোথায় টানা হইবে! বর্ণাশ্রম বাদ দিয়া হিন্দু ধর্ম হয় না। গীতায় শ্রীভগবান বর্ণাশ্রম ধর্ম তাঁহার সৃষ্টি বলিয়াছেন। অথচ আজ এই ধর্ম আর মানা সম্ভব নহে! তাহা হইলে হিন্দু ধর্মের কি হইবে? হিন্দু কোড বিল তো প্রমাণ করিয়াছেই যে হিন্দু ধর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার সরকারের রহিয়াছে। তবে কি ভারতবর্ষে দুইপ্রকার নিয়ম চালু হইবে।

গুপানন্দ তাই চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। যেরূপ ভাবে দেশে ক্রোধ বাড়িতেছে, যেরূপ ভাবে গ্রামে গ্রামে হরিজনদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলিতেছে তাহাতে মনে হয় দেশ উল্টাপথে চলিতে সুরু করিয়াছে।

চলুক। গুপানন্দ ব্যক্তিগত ভাবে তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। তাহার তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তো বহুদিন রহিবে। বিশ্বসভায় তাহার আসন হইবে সর্বোচ্চে। সুতরাং ভাবনা রহিয়াই যায়। তরুণ সমাজের উপর আস্থা রাখিতে গুপানন্দর জুড়ি নাই। কিন্তু পাঞ্জাবে কাহারা উৎপাত করিতেছে? ওই তরুণের দল! তবু গুপানন্দ কহিবে ভরসা হারাইও না। অতীতে মানব সমাজ বহু দুর্যোগের মধ্য দিয়া গিয়াছে, শেষ পর্যন্ত অশুভ বিজয়ী হয় নাই। বিজয়ী হইয়াছে মানুষ। হিটলারকে ভুলি নাই।

১৯৪৬ সালের মসীমাখা সাম্প্রদায়িক হানাহানির দিনগুলি ভুলি নাই। সে সব রজনীও কাটিয়াছে। আজকের সংকটও কাটিবে।

গুপানন্দ সম্পাদককে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে। শ্রীমান তাগাদা না দিলে গুপানন্দ লেখনী ধরিত না। আর লেখনী না ধরিলে তাহার মধ্যে এখনো এতটা আশা জাগিয়া রহিয়াছে সে নিজেও জানিতে পারিত না।

পাতার আগুন

বরুণ চৌধুরী

পলাশ তার বৌ বসুমতীর দুটি বিশেষ যুগল অঙ্গের সপ্তাহান্তিক নাম রেখেছিল : শনি-রবি। পাঁচজনের সামনে বৌয়ের সঙ্গে অশ্লীলতা করার দরকার থাকলে পলাশ ভিজে বেড়ালটির মত বলে,

—সারা হপ্তা আমি গাধার খাটুনিতে রাজি, শুধু আমার শনি-রবিতে কারুর হাত না পড়লেই হলো। পলাশের দিকে বসুমতীর দৃষ্টি তখন তেলেবেগুনে। এই সূত্রে বসুমতীকে পলাশ আরো কিছু থিস্তির টরেটক্কা শিখিয়েছিল যা কেবল নিবিষ্ট স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই চাপা থাকার কথা। অনুসূয়া যে তবু ওদের হাঁড়ির খবর পেত, তার জন্যে দায়ী বসুমতী নিজে। অনুসূয়াকে কিছু লুকিয়ে ওর পেটের ভাত হজম হয় না। গোপনকথার হয়ত মজাই এই। কারুর কাছে উজাড় করে দিতে না পারলে স্বস্তি নেই। আর ওরা দুজন এক হলে জগৎ-সংসার মিথ্যে। তখন এ-দুটি নারীকে আর কিছুই স্পর্শ করে না।

সে সময় হঠাৎ রোদ-উথ্‌লানো জানলায় তার মেয়ে মৌরীর উড়ন্ত ঝুঁটির দিকে নজর পড়লে গুমোট গলায় বসুমতী ধমকায়,

—তোমার কি বাইরে কোনো খেলাধুলো নেই, চব্বিশ ঘণ্টা বড়দের সঙ্গে কেন মৌ?

মায়ের আচমকা রাগের থেই ধরতে পারে না মৌরী। তবে গলায় গুঁড়োলঙ্কার ঝাঁজে একটা কিছু আন্দাজ করে। ছুটে পালায়। বসুমতীর তখন হয়ত নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। বাইরে আটটা বেলার নরম ডিমভাজা রোদ। প্লান্টে যাবে

পলাশ। মৌরীর স্কুলের তাড়া। চানের জল, দাড়ির গরমজল, টিফিন, কেডস্-এ খড়ি, ভাত, ফ্রিজে মাছ তোলা—সময় তখন ধোঁয়াওঠা সসপ্যানে ফুটছে। কিন্তু সেই সময় অনুসূয়া এসে পড়লেই সব ভোজবাজিতে উবে যায়। এলোমেলো হয় বসুমতী নিজেও। সামান্য এক বোতল বাড়তি দুধ এসেছে অনুসূয়া কিন্তু এক বোতল দুধের ওপারে তখন অপার ক্ষীরসাগর। বাইরে বসে বসে শালিখরোদ উড়ে যায়, ছায়ার দর্জি ফিরে যায়। গীতবিতানের প্রেমপর্বে হারিয়ে যায় ধোপার হিসেব। শশব্যস্ত পলাশ শুধু শোবার ঘরের জনহীন উপকণ্ঠ থেকে মাঝে মাঝে "য়ে-ই, শুনছো" ধ্বনি শুনতে পায়। এই বিশেষ ধ্বনিটি এমন এক ধরনের আধুনিক বিশল্যকরণী যা দিয়ে এখনো স্ত্রীরা নেতিয়ে পড়া স্বামীকে উজ্জীবিত করে। পলাশ যদিও নির্জীব নয়, তবু যে কেন বসুমতী! মাঝে মাঝে আলটপকা প্রায়ই পলাশের মনে হয় বসুমতীকে হয়ত এ শহরটায় ঠিক ধরে না। ক্লাব লাইব্রেরী নাটক কবিসম্মেলন মেলা চিত্রপ্রদর্শনী—সবই আছে। তবু হাজার হোক পুরো সহরটাই তো একটা ছোট্ট টেলিফোন ডায়াল। অথচ বসুমতী এক অপার ধনধান্য—আকাশ চায়। ডোরাকাটা মস্ত সংসারী-ছাতার মত নিজেকে মেলে ধরতে চায় অনেকের মাথায়। ষ্টিল-প্ল্যান্টের কিছু উচ্চতি ইন্‌জিনিয়ার, টেকনোলজির একপাল তরুণ তুর্কি, এখানে এরাই বসুমতীর নিজস্ব রেজিমেণ্ট। এদেরই একটা ছোটখাট ভিড়ের ব্যাণ্ডেজ বসুমতীকে জড়িয়ে থাকে সারাক্ষণ। বসুমতীর শরীরে অচেনা লতাগুল্মের বুনো সুবাস। কখনো বা অদেখা হিলস্টেশানে সুঠাম পাইনের যৌনতা। ঝাউফলের তীব্র উন্মুখ গন্ধ। ওর কাঁটা-আলগা ভাঙা খোঁপা, নাকে থুতনিতে তেলতেলে ছায়া আর চোখদুটোয় কেমন বাসাবদলের উদাসবিকেল। অথচ এই চোখ এই মুখ সম্পূর্ণ বদলে যায় ভিন্ন পরিবেশে। নাটকে ডিস্‌কোতে জিনের গেলাসে বরফকুঁচির মত ঠুংঠাং বাজে। ওর লম্বা ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে তখন পথিকমাত্রই পথ হারায়। এই খুদে সহরের কলেজ বাজার ক্লাবে শ্রাবণের জলকাদা ভেঙে শ্লথ আনমনা রাজহাঁসের ভঙ্গীতে বসুমতী ভেসে যায়। ওর শাড়ি ওঠে পুরুষের চোখের আশ মিটিয়ে। পায়ের থয়রী ডিমে ভিজে সায়ার লেশ লেগে থাকে গভীর সমুদ্রগামী জাহাজের ফেনা হয়ে।

স্থলপদ্মফোটা শরতের এক রাঙা বিকেলের কথা মনে পড়ে পলাশের। এ-বাড়ি তখনও শেষ হয় নি। ছাদ নেই, জানলা দরজা বসে নি। লিন্‌টেল ঢালাই হয়

নি। বসুমতীর হঠাৎ খেয়াল, এ-বাড়িতেই কাল পিকনিক। এখন যেটা শোবারঘর, তার কোল-বারান্দা অদ্য শেষ হয়েছে, যদিও বসুমতীর কোলে তখনও মৌ আসে নি। দুজনেই ঝাড়া-হাত-পা। মাত্র একটি ঘর সাফ করতেই বিকেল গড়িয়ে রাত। দেওয়ালে প্লাস্টার নেই, খরখরে বালির কাজে ধরাপড়া অন্ধকার। পাতিলেবু টিপে মহুয়ার গেলাস হাতে পলাশ দেড়চোখে লক্ষ্য করছে আধচেনা এক ভদ্রমহিলার কীর্তি যার সঙ্গে মাত্র এক দিবসের রান্নাবাড়ি পাততেই যেন দুনিয়ায় আসা। বসুমতীর বাঁ হাতে একটা জ্যান্ত মোম পুড়ছে, ডানহাত খড়ি দিয়ে কিসব হিজিবিজি আঁকতে ব্যস্ত। কুসুম কুসুম বাতাসে শিখা দোলে, বালির ঘর ধড়ফড় করে। মানুষের ইমারত কাঁপে। ভিজে প্রবালের রং বসুমতীর শাড়িতে। দেওয়ালে দেওয়ালে নাচছে ওর শরীরের ছায়া, যেখানে নদীমুখ মোহনা লাক্ষাদ্বীপ লেগুন আবদারে নোনা। বসুমতীর লম্বাটে শরীর একসময় অজ্ঞাতকুলশীল, আকাশ ছুঁইছুঁই। হঠাৎ সেই বাড়ন্ত ছায়াশরীরের দিকে হাত বাড়াতে চায় পলাশ। পা টলে, হোঁচট খায়। একসময় নিজেই গোবেচারী অন্ধকারে আটকা পড়ে বসুমতী। প্রথমটা চড়া মহুয়ার গন্ধে ঝাপট। পরে যে বলশালী বাতাসে শিখা সরে তাতেই ভেসে যায় হালভাঙা নাও। ঘৃণা বা ভালবাসায় তখন প্রভেদ বড় নেই। সিমেন্টের কঠিন ধুলোটে মেঝেতে আছড়ে পড়ে অন্য ভূমধ্যসাগরীয় ঢেউ। পরদিন রাজমিস্ত্রিদের ডাকে দুজনের যখন ঘুমভাঙে, তখন দিগ্বিদিকে আশ্বিনের রোদ শাদা ময়ূরের পেখম মেলেছে।

দেওয়ালে দেওয়ালে খড়ির রেখায় ধু ধু বরফের ঢেউ। সেই নিঝুম বরফের প্রান্তরে পাল পাল ভিখিরি-পেঙ্গুইন হাত পেতে। ভারতের বুকে নর্থপোলের 'কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল' এক সকাল। পরেও পলাশের মনে কতবার ফিরে এসেছে এদিনের অসাবধানী উড়নচণ্ডী স্মৃতি। সেদিন বসুমতীকে যে-চুমু খেয়েছিল তার স্বাদ শারীরিক মিলনের থেকেও তীব্র, বেশি আকাশচারী, তাই দুর্লভ, মায়াবী। এ চুম্বনে কোনো গেরস্থালী নেই। এরপর জীবনে অনেক ফাঁপা অধরস্পর্শ, ফালতু প্রতিশ্রুতি, ছল প্রেম এবং চোখের জলের চতুরালি পেরিয়ে মানুষ যেভাবে চৌকশ হয় পলাশও একদিন সেভাবেই বিধুর এবং নষ্ট হয়। তবু সে-চুমুর স্বাদ আজও যেন ঠোঁটে লেগে। এমন মাত্র গুটিকয় দুয়োরানী-চুমুতেই ঘর বাঁধার অভিলাষ থাকে না, তাই মনে পড়ে বার বার।

সেদিন পিকনিক হয় নি। রিহার্সালের নাম করে অরুণ ভাস্কর রবিপাণ্ডের দল ছেঁকে ধরেছিল বসুমতীকে। সবটাই ছুতো। আসলে পুজোয় বসুমতীর

কলকাতা পালানোই কাল হয়েছে। বসুমতী থাকলে এ সহরের সমস্ত ইউক্যালিপটাস দোলে, বসুমতী বিহনে এখানে সমস্ত শালগাছের পাতা ঝরে যায়। এদের হাত থেকে রেহাই পেতে তিনটে বেজে যায়। বিকেল পাঁচটায় আবার ইন্‌স্টিটিউট হলে কবি সম্মেলন। কলকাতা থেকে কত নামী কবি সাহিত্যিক ও রঙিন শিল্পীর মেলা। উঠবে সবাই বসুমতীর এখানেই। বারান্দায় আধখাওয়া কফির কাপ, রেলিংয়ে ওয়ান-ফর-সরো শালিখ। বসুমতী নেই। রোদের ছোট্ট শর্টস্-পরা দিনটা ষ্টেডিয়ামের শাদা ট্র্যাকে টক্কর দিয়ে ফিরে যায়। পদ্মসভা যখন শেষ ইন্‌স্টিটিউট হলে শীর্ণ শীতশীতে প্রহেলিকায়। তখনও বসুমতীর পাকা কলার মত মিষ্টি কণ্ঠস্বর ঝুলে থাকে: "পৃথিবীকে মৃত সবুজ সুন্দর কোমল একটি দেওয়ালিপোকার মতো মনে হবে না তোমার ।" ওরা টেপ করেছিল। বসুমতী নিজে তখন কলকাতায়। ওখানে হাজার ঢেউয়ের মাথায় ও এক স্ফটিকের ঊর্মিমালা। বইপাড়া, কলেজ ষ্ট্রিট কফিহাউস, দুপুরের মেট্রোতে গান গাইছে মরিস শেভেলিয়র —ভিজে ঠোঁট, রোদভাঙা গলা। মাই ফেয়ার লেডি অড্রের স্ট্রবেরিলাল ঠোঁটে সেই শিউলি হাসি। কখনো স্ট্র্যাণ্ডরোডে গঙ্গার ধারে বসুমতীর গলায় সূর্যাস্তের সংলাপ ফোটে:

—আমি কিন্তু এমন চাইনি অতীন! যে ভালবাসা মানুষকে একা করে, তাতে কোথাও না কোথাও স্বার্থ লেগে থাকে। ওরকম কাঁদো কাঁদো মুখ ভাল্লাগে না। ভুলে যাও। ভাবো না আমরা সবাই এসেছি 'দৈব পিকনিকে', পাতার আগুন ঘিরে সবাই বেশ হাত ধরাধরি করে গাইছি নাচছি ··। হেঁট হয়ে ঝরা কৃষ্ণচূড়া তোলে বসুমতী। কোথাও কোনো জাহাজের ভোঁ বাজছে না। তবু যেন শুনতে পায় কোনো কূলত্যাগী জাহাজের ভোঁ। প্রাণ কাঁপে। অন্ধকার আঙুলের বৃন্ত থেকে ঝরা কৃষ্ণচূড়া দ্বিতীয়বার ঝরে পরে মাটিতে। সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউ কফিহাউসে আবার দৃশ্যপট একেবারে উল্টো। কুশীলব একদম অন্য। তখন প্রেসিডেন্সির দুটো ইংরিজির মাস্টার, দুটো ফার্স্ট ক্লাশ ইকনমিস্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু এস, এফ আর সদ্য খালাসিটোলা ফেরত একতাড়া গরম ধোঁয়াওঠা কবি। দেখলে মনে হয় ওরা বসুমতীর পক্ষে কেউ হট কফি, কেউ কুড়মুড়ে পকৌড়ি। এখান থেকে জর্দা-জুতো-ধূপের কত গন্ধসাগর পেরিয়ে সেই উত্তরে শম্ভু মিত্রের নাটক দেখতে যাওয়া। ট্যাকসির খোঁজে দিশেহারা বসুমতী তখন চটির স্ট্র্যাপে সময় আঁটতে হিমশিম। হঠাৎ পদাতিক বসুমতীর কানের পাশেই দমকা হাওয়া, টায়ারের তীব্র আর্তনাদ। দরজা খুলে দেয় অতীন্দ্র সেন,

—জানতাম এরকম একটা কেলেঙ্কারি করবে। বসুমতীর হাসিতে যেন আরশিভাঙা আলোর ছটা।

—ই-স, সোনাছেলে। তুমি আমার কলকাতার ক্রাসপিস। ট্যাকসিতে পা দিয়েই বসুমতীর অমন ফুরফুরে মেজাজটা বিগড়ে যায়। ভেতরে দুটি অচেনা জীব রমেন বসু, কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। অন্য ছেলেটি কাগজের ব্যবসা করে। নাম এস. রুদ্র। নিশ্চয়ই দুপুর থেকে বেদম বিয়ার টেনেছে। মুখে বিয়ারের ভকভক আর সেইসব উদাস-উদাস ঢেঁকুর। সাধারণত এসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না বসুমতী। কিন্তু মলাটছেঁড়া মানুষ দেখলে ও মনে মনে পিছু হাঁটে। পৌরুষটাই আসল সৌরভ। সেটাই পুড়ে গেলে পানশে-ধরা গন্ধে হায় হায়। এস রুদ্র ছেলেটির পেডিগ্রি জানে না বসুমতী। ওর কনুইয়ের গুঁতোয় সরতে সরতে দরজা খুলে পড়ে যাওয়ার দাখিল। রুদ্রর টুথব্রাশ গোঁফ, সসেজের মত হাড়গোড়হীন নাক, ভারী কব্জির রোমে সিকোর সোনালী ঝিলিক প্রথম থেকেই অস্বস্তি দিচ্ছিল বসুমতীকে! ঠোঁট-নাক-স্তন-নাভিতে যেভাবে মেয়েরা পুরুষের ভেতরে ডুমো মাছি দেখতে পায়, বসুমতীও সেভাবেই সব বুঝেছে। সে জানত নারীপুরুষের ডাবল্‌স্-এ একে অন্যের কোর্টে ঢোকার জন্যে একটা অধিকার অর্জনের ব্যাপার থাকে—খেলোয়াড়ী বাতাস। ওটাকেই মেয়েরা দাম দেয়। ভিড় বা অন্ধকারের সুযোগে মেয়েদের নিতম্বে চিমটি কেটে বিশ্বকাপ জয় হয় না। অতীন্দ্রের সেই খেলোয়াড়ী স্বভাবটি বসুমতীর চেনা। অনেক গোলমেলে মানুষের দুর্যোগে একস্ট্রোকে দেশলাই জেলে সে সমস্ত আবহাওয়াকে ঝিকিয়ে দিয়েছে। কোনো কোনো পুরুষের মধ্যে এরকমই পুরোনদিনের পথচেনা কামিনীর গন্ধ থাকে। অথচ আজ কোথায় সে অতীন। সারাক্ষণ একটা ডুমো মাছি তাড়িয়ে তিতিরিরক্ত বসুমতী আচমকা অতীন্দ্রের ঘাড়ে একটা চাপড় মারে,

—এই, তোমার বন্ধুদের গায়ে বড্ড মদের গন্ধ। আমার গা-বমি করছে। আমি নেমে যাচ্ছি।

এস রুদ্র পেঁচো মাতালদের সেই পরিচিত হলদে হাসি ছেটায়। বস্তাপচা মস্করার তাল করে,

—আপনি বুঝি মদ্যপায়ীদের ঘেন্না করেন? আর স্তন্যপায়ী? বসুমতীর আহত অস্থির চোখ বন্ধকাঁচে মাথা কোটে। কাঁচ নামাবার হ্যাণ্ডেলটা নেই। লাল রেকসিনের বুকে তার শূন্যগর্ভটা শুকনো রক্তের কালো ক্ষতের মত। মরীয়া

বসুমতী তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে,—ধ্যাৎ।

পরের অংশটি বারাবাড়ি রকমের অতিনাটকীয়। যে কোনো সাংসারিক তাণ্ডবে যেমন হয়। কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ তখন হঠাৎ হি-হি করে হেসে দেয়, ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে, হাতের কাছে যা পায় ছুঁড়ে মারে। অথচ এব্যাপারগুলো নাটক নভেলে দেখলে আমরা সেঁটকাই। অতীনের অপ্রস্তুত মুখে যা-হবার-হয়ে গেছে ধরনের জোড়াতালি অন্ধকার। হঠাৎ দরজায় ধাক্কা মারার শব্দে হতভম্ব ড্রাইভার আপনিই বাঁয়ে চাপে এবং প্রায় ছিটকে বেরিয়ে যায় বসুমতী, সঙ্গে অতীন। দুজনে বহুক্ষণ মহাজাতিসদনের সিঁড়িতে দুটি জীবন্ত অন্ধকার। ওপরে শীতার্ত কলকাতার লাল চিতা চুপচাপ নিভে আসে। তার ছায়া অবসন্নতা বসুমতীর গলায়,

—আজকের কথা আর কোনোদিন নয়, কেমন? এসো আমরা অন্যকথা বলি।

যার মুখ নেই সে অন্যকথা কিভাবে কইবে অতীন জানে না। বিপর্যস্ত অতীন তাই একটি ছোট্ট প্রশ্ন করে,

—যেমন?

—যেমন ধরো আমাদের নতুন বাড়িটার কাজ শেষ। বলো তো ওর চেহারা কেমন হবে, গায়ের রং কিরকম, হাসিটা কেমন। পারবে না। আমি বলে দিচ্ছি। হারানো-প্রাপ্তি বিজ্ঞাপনে যেমন বলা হয় সেই ঢংয়ে বসুমতী গড়গড়িয়ে বলে,

—গায়ের রং পেস্তা সবুজ, ঠোঁটে শাদা বোগনভেলিয়ার হাসি, চেহারা ঠিক পাহাড়ী ঝর্ণা। তোমাদের সঙ্গে কত মানুষ আসবে কলকাতা থেকে। আমরা 'চার অধ্যায়' চ্যারিটি-শো করবো। তুমি অন্ত আছই। আমি এলা। যা উঠবে স-ব টাকা দিয়ে একটা ঝকঝকে হাসপাতাল…।

বাকি কথা শুনতে পায় না অতীন। বসুমতীর চোখে সিনেমাস্কোপ। মস্ত পর্দায় আলো ঝলমলে অন্য এক মহাজাতিসদনের স্বপ্ন। মহাজাতিসদন—রবিঠাকুরের দেওয়া নাম। ভিত্তিস্থাপনে এসেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সঙ্গে বাংলার রাণাপ্রতাপ সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্রের রোদঝরা গলায় একটা প্রকাণ্ড স্বপ্নের ডালিয়া। ভেতো বাঙালির জীবনে সেই শেষ স্বপ্নের ফুল স্টিলের পাপড়ি মেলছে।

সেবার কলকাতা থেকে ফেরার পর হঠাৎ একদিন মাঝরাতে জাগ্রত বসুমতী। শরীরের সঙ্গে চাদরের মত লেপ্টে থাকা পলাশকে পাশে খুলে রেখে বলে,

—কলকাতায় সেদিন তোমার বন্ধু সুব্রতনিয়ম খেতে বলেছিল। রাত্তিরে বারান্দায় আমাকে একা পেয়ে চুমু খেতে চাইল। আপত্তির কিছু না। কিন্তু ওকে বরাবরই বেশ হ্যাকা লাগে। গায়েই শুধু ভুরভুরে আফটার শেভ, মেয়েদের সঙ্গে কথাই বলতে জানে না। চেহারাও ঠিক একটা আফটার শেভ-এর সৌখিন শিশি। ফলে পুরো ব্যাপারটাই জোলো লাগলো, জমলো না। কি, বলছ না যে কিছু? বসুমতীর গলায় ঘুমের লেশ নেই। বরং ব্যাঙ্ক কাউন্টারের মত কেজো, খটখটে। ওর লম্বা ঘাড়ে নিজেরই দাঁতের দাগবসা উল্কিতে আঙুল বুলিয়ে হাই ভাঙা গলায় পলাশ বলে,

—পুরু-আলেকের সে সব গ্রীক পৌরুষ আজ আর পাচ্ছ কোথায়। গ্রীসের ঐসব পাউরুটি বাইসেপ ভুলে যাও। এখন বড়জোর বিদেশী পারফিউম ছেটানো দিশি জগন্নাথ। এছাড়া গতি নেই। মাঝে মাঝে তাদেরই দুএকটার মাথা চিবোলে ক্ষতি কি। লাভের মধ্যে মিয়োনো দাম্পত্যে নতুন ঝাঁজ ফোটে।

অন্যসময় হলে বসুমতী হয়ত একটা লাগসই জবাব দিত। আজ নীরব। অকস্মাৎ যেন পর্দা সরছে না। হল্ অন্ধকার, দর্শক উদ্‌গ্রীব, তবু—। আশ পাশের পোষমানা আসবাব, ভীতু জলের গেলাস, ঝিমন্ত চেয়ার এবং খিটখিটে ঘড়ির হট্টগোলে ক্লিষ্ট পলাশ একবারমাত্র ঘাড় তুলেছিল। চারদিকে বালিস বিছানা লেপে ভরা বিশাল তুলোর রাজত্বকে তার এক নিঃসীম বরফের দেশ মনে হয়। এই সীমাহীন তুষার রাজ্যে স্বামী স্ত্রীর অনেক নিরুচ্চার সংলাপ বরফের নিচে নীল হয়ে থাকে। বসুমতীর ফিরোজা নীল নাইটিপরা শরীরটাও আজ সেই তুষাররাজ্যে বহুদূর। বেডসাইড্ টেবিলে ওর পুরোন ফটোটাই শুধু আপনমনে জুম্ করছে, ছোট হচ্ছে বড় হচ্ছে। ওখানেও বসুমতী নীলপরী। বিনয় তালুকদারের বাগানে সদ্য জলভেঙে উঠেছে। গাঢ় অন্ধকারেও পলাশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বেশি জল ঘেঁটে বসুমতীর আঙুলের ডগা, পায়ের পাতা, ঠোঁট সব চুপসে নীল। ওকে জল টানে। ওর লম্বা হাত-পায়ের গড়নে দূর নদীর ঘুঙুর। বিনয় তালুকদার ওকে মাছরাঙার ইংরিজি নামে ডেকেছিল—'কিংফিসার',—উত্তরে বিনয়ের বিয়ারবোতলে আঙুল দেখিয়ে বসুমতী বলেছিল,

—ওটা একটা বিয়ারের নাম, আমি কুইন্-ফিসার। ভর্তি বিয়ারবোতলটা বিনয় তালুকদার পুকুরে ছুঁড়ে দিয়েছিল, ডুবে গেল এক অবনত মাছরাঙা। আজ

মার্চের উতল হাওয়ায় নবজাগ্রত প্রেমিকও তাকে উদ্ধার করতে পারে না। আর বছরের মলিন চাঁদমালাদোলা ফিসফিসে গলায় বসুমতী বলে,

—তুমি দুঃখ পেও না পলাশ। আমার ডানবুকে বেশ কিছুদিন একটা শক্ত ড্যালার মত কি যেন লাগে, ব্যথা করে। হয়ত ব্রেষ্ট ক্যানসার।

শব্দগুলোতে পাহাড় চৌচির করা গোপন ডিনামাইট ছিল। নিজের অজান্তে পলাশের পা চলে যায় ব্রেকে। অচেনা পাহাড়ী ঢালে তার সাবধানী কণ্ঠ শোনা যায়,—পাগলামি করো না। দেখতে দাও আমায়। ট্রিগারটেপা নিষ্ঠুর ঠাণ্ডা গলায় বসুমতী বলে,—না। কাল দুজনেই আমরা কলকাতা যাচ্ছি।

দুমাসে কতবার যে কলকাতা। বসুমতীর ডানবুকের ক্যানসার চুপিসাড়ে বহুদূর দখল নিয়েছে। এখন আর ওসব তাপ বা ওষুধবিষুধের আওতায় নেই। ডাক্তারের মতে ডান স্তন বাদ দেওয়া ছাড়া গতি নেই। বসুমতী সময় চায়। এখন ওর অনেক সময় দরকার। জানে না সময় কতবড় বিশ্বাসহন্তা। বোঝবার জন্যে একলা মানুষকে স্রেফ গভীর পাতকুয়ায় ফেলে পালায়। উদ্ধার পাবার সামান্য দড়িটাও বাড়ায় না। বসুমতী ভেবেছে সময়ে সব সয়ে যায়। নিজেকে মানিয়ে গুছিয়ে নেবার অবসর চাই। সব ভুল। কোনোদিনই অবসর আসে না। বসুমতী ক্রমশই বেশি বিস্রস্ত, এলোমেলো হয়। এখন সে আড়চোখে অন্য মহিলার বুকের দিকে তাকায়। কারুর টগবগে বুক দেখলে আনমনা হয়। কলকাতায় ডাক্তারের কলিংবেলে হাত দিয়ে সে রীতিমত চমকে উঠেছিল। শাদা বেল্‌টা ঠিক পনেরো বছরের থুকিন্তন। বোঁটায় চাপ দিতেই ভেতরে ঘণ্টা বাজে, সিঁড়ির আলো জ্বলে। সিঁড়িতে হালকা চটির শব্দ তরতরিয়ে নামছে। ঠিক মৌরীর মত। অবিকল ওর বয়সী মেয়েরা যেমন নামে। দরজা খোলার শব্দে বসুমতী গোঁয়ারের মতো বাইরে ঘাড় ঘুরিয়ে নেয়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় কোনো না কোনোদিন মৌ তো সব জানবেই। তক্ষুনি ফের এক ঝটকায় ঘাড় ঘোরায়। দরজায় দাঁড়িয়ে টিন্‌টিন্ হাতে এক কিশোর। ডাক্তারের নাতিপুতি হবে। আরো একবার এমনি। সেটা সুরেন ব্যানার্জী রোডের ঠিক মোড়ে। তখন অফিস ছুটির ভিড়। রাস্তা পেরুবার জন্যে এক মহিলা দাঁড়িয়ে। ব্রা-র স্ট্র্যাপটা হয়ত লাগছিল। আঁচল আলগা দিয়ে দু-আঙুলে ব্রা খুঁচিয়ে ভারী স্তনের ঘুম ভাঙালেন, ব্রা-র লাগাম ঠিক করে ওদের আবার ঠিকঠাক শুইয়ে দিলেন। ব্যাপারটা চুকে যেতে চটপট লাইমিনিট-ব্যাগ গোছাবার ভঙ্গিতে ব্রাউজের টিপকল এঁটে, আঁচল টেনে চকিতে ভিড়ের মধ্যে উধাও।

চারিদিকের গরম জনস্রোতের মাঝখানে দাঁড়িয়েও বসুমতী নিজেকে হারিয়ে ফেলে। মহিলার ছুটিমাত্র ঘুম কাতুরে স্তন বহুক্ষণ বসুমতীকে আনমনা করে দেয়। ওনার ফর্সা হাতে লাল কাঁচের চুড়ির পাশে সাদা শাঁখা। বর-সোহাগী। এই গিসগিসে ভিড়ে বুক গোছাবার আদিখ্যেতা আছে অথচ দুনিয়ার চোখ যে ওকে গিলছে সে খেয়াল নেই। যতই দেমাক থাক এমন আলাভোলা বৌকে ওর বর নিশ্চয়ই ধ্যাঁতানি দেয়। এতেই সে খুশি।

বসুমতী ঠিক করেছে ফি-মাসেই যখন কলকাতা আসতে হচ্ছে তখন কাটাকুটির রাস্তায় পরে গেলেও চলবে। এখন ওকে বাইরে থেকে দেখলে কেউ ধরতেই পারবে না কোথায় কি পুড়ছে। সব তেমনি আগের মত। সেই দিনরাত টো-টো। হীরেন জানার থিয়েটার, রক্তকরবীর মহড়া, মিনি পৌষমেলা, প্রকাশ কর্মকারের ছবির প্রদর্শনী, বানসাই, চ্যারিটিম্যাচ এবং ইন্‌স্টিটিউটহলে অবিরাম পদ্যপাঠ। দুটো নকশাল ছেলে বসুমতীর বাড়ি আশ্রয় নিয়েছিল। তারা দিব্যি খায়দায় থাকে। নড়ার নামটি নেই। ওরা জুট-টেকের তুখোড় ছাত্র। সুতরাং ওদের নিয়ে এখন পাট-শিল্পের বিপুল তোড়জোড়। পাটের ওপর কোনো একটা উজ্জ্বল ল্যাকার ধরাতে পারলেই নাকি সারা এ্যামেরিকার মার্কেট হাতের মুঠোয়। কিন্তু এতো ব্যস্ততার মধ্যেও কোথায় একটা ন্যাড়া নিমডাল কাঁপে। সেখানে পাতা নেই, পাখি নেই। খুব কাছের মানুষ সেটা ঠিকই টের পায়। অন্তত অনুসূয়া-হিরন্ময়ের দৃষ্টি এড়ায় না। ওরা অনুভব করে আজকাল পলাশ যেন তলেতলে বসুমতীকে খানিকটা ডানার আড়াল দেয়। যদিও বসুমতী মোটেই মুখ-গোমড়া থাকার মেয়ে না। জন্মাষ্টমীর ছুটিতে চারজনে আনতাবড়ি বেরিয়ে পড়েছিল। বসুমতীর সর্ষে-হলুদ সাজ, কপালে তামার চাঁদের মত টিপ। হলুদ ব্লাউজের নিচে ওর টানটান পেট, গভীর নাভি-সরোবর। একটা পোড়ো গির্জার পাশে গাড়ি থেমেছিল। গির্জা দেখলেই বসুমতীর চোখে দুধভোরে খ্রীশমাস, খুশির ঘণ্টা। অথচ এ-দিনটা ভাদ্রের অতি সাধারণ একটি হাবাগোবা দিন। গাড়ির উইণ্ডস্ক্রীনে বৃষ্টিফোঁটার ওপর সন্ধের কালো আকাশ থেকে একসার কালো মুক্তো। চারিদিকে ধূপছায়া বিকেল। হয়ত আরো বৃষ্টি হবে। জোলো হাওয়া। অথচ একটু আগেও কত সরসরে আলো ছিল। দূরে কালো আকাশের তলায় বসুমতী ঠিক যেন হলুদ ভেলভেটের খেলাভাঙা জিরাফ। পলাশ ঐদিকে তাকিয়ে কেমন যেন তাঁবু গোটানো সার্কাসবয়ের গলায় হিরন্ময়কে বলে,

—তোদের খুব বোরিং লাগে, তাই না হীরু?

সিগারেটে হাল্কা টান দেওয়া লঘু সুরে হিরন্ময় জবাব দেয়,

—বটেই তো। তোর গাড়িতে বিয়ার খেতে খেতে দিব্যি ফুরফুরে ফড়িং হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি—এ তো বোরিং লাগারই কথা।

—ঠাট্টা রাখ। বুঝিস তো সব। এত যে বকবকানি সবই একটা কিছু আড়াল করার জন্যে। চারদিকে এতো স্টিরিও ডিস্‌কো লাউডস্পিকারের ঘটা কেন। ভেতরের নিস্তব্ধতা ঢাকতে। এসব ধান্দা কিন্তু আমাদের আগে ছিল না। তুই ভেবে ছাখ, ঐসব পাহাড়গুলোয় কতদিন আমরা চুপচাপ স্রেফ সূর্যডোবা দেখেছি। অথচ কত তাড়াতাড়ি সব পাল্টে গেল। ঠিক আজকের বিকেলটার মত। ভুল বুঝবি না তো? খেলার দোকানে সাজানো চামড়ার গ্লাভসের মত পলাশের নিঃসাড় হাত ঠিক হিরন্ময়ের পাশেই। হিরন্ময় সেই শিরাময় চামড়ার গ্লাভস্-এ নিঃশব্দে অল্প চাপ দেয়।

চুলের ফিতে খুলে সবে স্নানে যাচ্ছিল মৌরী। তাকে কাছে ডেকে পরিষ্কার চাঁচাছোলা গলায় বসুমতী বলে,

—জানিস, ডাক্তার বলেছে আমার একটা বুক পুরো বাদ দিতে হবে।

মৌরী যেন আকাশ থেকে পড়ে। প্রথম ধাক্কায় সে শুধু ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে। পরে হাঁটুতে ফ্রক তুলে ছোট্ট পুঁটলি হয়ে মায়ের পায়ের কাছে,

—তোমার খুব লাগবে, না মা?

—হুঁ

—তোমার ব্রা-গুলো কিন্তু দারুণ। পরলে কেউ বুঝতেই পারবে না তোমার একটা বুক নেই।

ভেতর পর্যন্ত শিউরে ওঠে বসুমতীর। কানে কেউ গরম সিসে ঢাললো। ঐটুকু পুঁচকে মেয়ের গলায় হঠাৎ যেন লেডি ম্যাকবেথ কথা বললো। বসুমতী একটা কিছু ধরবার জন্যে হাত বাড়ালো। মৌরী ততক্ষণে একছুটে বাথরুমে ঢুকে দরজায় ছিটকিনি। বোতাম না খুলেই কাঁধ থেকে ফ্রকটা নামাতে গিয়ে বগলের সেলাই ফ্যাঁস। আয়নায় নিজের বুকের ছোট্ট ছুটি বেলকুঁড়ির দিকে একপলক তাকায়। হঠাৎ বাঁহাতের জবরদস্তি চাপে নিজের ডানবুকটা প্লেন করার চেষ্টা করে। পারে না। দু-হাতে চোখ রগড়ায়। জলের তোড়ে গলার শব্দ শোনা যায় না। মৌরীর বাবা মস্ত ইন্‌জিনিয়ার। নদীর বুকে স্লুইস গেট সারাতে পারে আর মানুষের বুক মেরামত করতে পারে না, তা আবার হয় নাকি?

বাড়ির পেছনের তারে শাড়ি মেলতে গিয়ে বসুমতীর মাথাটা কেমন ঘুরে

যায়। আজকাল প্রায়ই এমনি। সকাল থেকে মাথা ঝিমঝিম। ঘাড় থেকে শিরদাঁড়া চিবনো যন্ত্রণা। পিঠটা বেশি টনটন করে। অনুসূয়া কাছেই ছিল। ওকে শাড়ির খুঁটটা টেনে ধরতে বলে বসুমতী। জোলো হাওয়ায় শাড়ির পেট ফুলে ঢাউস। পেট ফোলা শাড়ির দিকে তাকিয়ে বসুমতী বলে,

—ছাখ অনু, মৌ যখন পেটে তখন এমনি একটা সবুজ দাঁতপাড় শাড়ি পরতাম। নিজের পেটটাও তখন এমনি জয়ঢাক। শাড়ির দাঁতপাড় দেখিয়ে পলাশ বলত পেটে কার দাঁত।

হাসির চেষ্টা করে বসুমতী। স্যুইচ অফ্ করার পরেও পাখার ব্লেড যেভাবে খানিকটা আপনি ঘোরে, ওর হাসিটা তেমনি বিদ্যুৎহীন। অনুসূয়াকে টেনে কাছে আনে। কানের কাছে মুখ রেখে বলে,

—একটা কথা বলব, কথা দে কাউকে বলবি না। হিরণ্ময়কেও না, পলাশকে তো নয়ই। কক্ষনো নয়, ঠিক আছে? তুই অতীনকে নিশ্চয়ই দেখেছিস, সেই অন্ত রে—। যেবার কলকাতায় অন্তর একটা অসভ্য বাঁদর বন্ধু ট্যাকসিতে জোরসে আমার ডান বুকটায় হাত দিয়েছিল। আর ছাখ ঠিক ঐ বুকটাতেই—। এসব মন্তব্যে কোনো যুক্তি নেই। যে হাত পাপ ছোঁয়, খুন করে, সে হাতে রক্ত লেগে থাকে না। যাকে ছোঁয় সেও অপবিত্র হয় না। তবু হাতে রক্ত পাপ পবিত্রতায় চিরদিনই অদৃশ্য কিছু সুতো থাকে। যোগাযোগের রহস্য সবসময় ধরা যায় না। কেমন ঘুম ঘুম গলায় বসুমতী বলে,

—তুই তো জানিস আমি কিছুই মানি না, পলাশও জানে আমার সবকিছু। কিন্তু ওভাবে বুকে হাত দেওয়া বড় বিচ্ছিরি, নোংরা লাগে। এঁটো হাতে বই খুলতে যেমন গা ঘিনঘিন করে পাপ টাপের কথা নয়। নোংরামিটা কার আর ভাল লাগে বল্। তুই কিন্তু বলিস নি কাউকে। পলাশ শুনলে কষ্ট পাবে। বসুমতীর গলায় নিড়ানো মাঠজোড়া আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণতা। খুব একটা ঘোরাফেরাও আর যেন সইছে না বসুমতীর। হাঁপ ধরে। পায়ের খিল ছাড়তে চায় না। যন্ত্রণা বাড়লে ওর পাদুটো বড় ছটফট করে। লম্বা সাঁতারু পা যেন বিছানার মরা নদীতে কুলোয় না। গাঙ্গ-নদীতে সাঁতরানো মানুষ যেমন বাঁধানো স্যুইমিংপুলে খাপ খায় না, তেমনি আড়ষ্ট লাগে বসুমতীকে! যেন পৃথিবীর জলভাগ ক্রমশ কমে যাচ্ছে, হাত পা খেলিয়ে বেঁচে থাকার মত অঢেল স্রোত নেই কোথাও। পলাশ ওপরের ঘরে শোয়। মৌরী মাঝে মাঝে মায়ের দোরগোড়ায় আমসিমুখে দাঁড়ায়, ফের তিড়িংবিড়িং-পায়ে নিচে নেমে যায়। শনিবার তার

রেলক্লাবে নাচ। একটুও প্র্যাকটিস হয় নি। নিচে টেপ-ডেকে গাঁকগাঁক টেপ চলে। মার্চিং ব্যাণ্ডে: উর্দ্ধগগনে বাজে মাদল নিম্নে উতলা ধরণীতল। কদাবার জন্যে পলাশ উঠতে চায়। বসুমতী ঘাড় নাড়ে। বড়দের ঝড়ঝাপটায় বাচ্চাদের দমিয়ে রাখা তার পছন্দ না। আগে এ-নিয়ে কত ঝগড়া। পলাশের মত উল্টো। সে শিশুকে নিষ্পাপ শিশুর ভূমিকায় রাখতে নারাজ। তার মতে বড়দের কারচুপি ওরা আগেই ধরে ফেলে। তারপর স্রেফ বাচ্চা সাজার ভান। আজ এসব নিয়ে কোনো তর্ক হয় না। বসুমতীকে নিয়ে পরশু কলকাতা যাওয়ার দিন। এবার পলাশের একাই ফেরা। নইলে এখানে মৌরী একা।

ভোররাতে বৃষ্টির শব্দ ঘুমভাঙা বসুমতী হু হু ইউক্যালিপটাস দোলা ভোর ফিকে-সবুজ বৃষ্টির ছাঁট আকাশের গায়ে পলাশের বন্ধ কাঁচের জানলার ওপারে আলো, পলাশের নিজের হাতে কফি, ঠোঁটে গন্ধরাজ সিগারেট, ড্রইংবোর্ড ব্লু-প্রিন্ট বিয়ে 'তুমি আবার বিয়ে…' বসুমতী দুচোখে বৃষ্টি-বিভ্রান্ত শ্রাবণ।

ট্যাকসিতে যেতে যেতে বসুমতী বাইরে মেঘলা কলকাতার দিকে তাকিয়ে। ছাইরংয়ের ভিড়ে উস্কখুস্ক এই কলকাতা ছেড়ে যেখানে খুশি পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। অথচ মার্চের নিমহ্লুদ ছোঁয়ানো কলকাতার রোদ বাতাস ছেড়ে স্বর্গেও সুখ নেই। মহাজাতিসদন পেরুল। খানিক পরেই ট্যাকসি ভবানীপুরের সেই হলুদ হাসপাতালের হাঁ-এ ঢুকবে। সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউ কফিহাউসের সামনে পুলিশের হাতে থামলো। পলাশের ঝাঁকড়াচুলে আঙুল ডুবিয়ে বসুমতী বাইরের দিকে ইশারা করে। বাস-স্ট্যাণ্ডের কপালে লালের ওপর বড় বড় কালো হরফে লেখা, 'একবারই তো বাঁচবেন, কেতায় বাঁচুন। চুলের ক্রিমের বিজ্ঞাপন। বসুমতী হাসে। ওর হাসিতে এখনো সেই শাদা টগর, লাল সুরকির স্টেশান। যদিও আজ সেখানে শেষ ট্রেন ছেড়ে যাওয়া মফঃস্বল প্লাটফর্মের নিশুতি রাত।

সন্ধেবেলা গানের খাতা হাতে বাড়ির দিকে মৌরী। সে হাঁটছে মই-বাছুরের নড়বড়ে পায়ে। আকাশের কালো পাথরবাটিতে দু-একটা চিনির মুড়কির মত তারা। গাছপালার সজল বিষণ্ণতা পেরিয়ে পার্করোড থেকে দেখা যায় ওদের বাড়ি, বারান্দা থেকে সাদা বোগনভেলিয়ার জলপ্রপাত। কলকাতা থেকে বাবা ফিরেছেন। বাবার ঘরে আলো। মৌরীর ঘরেও আলো জ্বলছে। একটা জানলাই যা অন্ধকার।

সম্পাদকীয়

এবারে আমাদের সম্পাদকীয়-র বিষয় ছিল রাজীব গান্ধী এবং তার দ্রুত সমস্যাসমাধানপ্রবণ সুফল-কুফল-নিরপেক্ষ মানসিকতা।

ইতিমধ্যে সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সদস্য কবিতার আঙ্গিকে সম্পাদকীয় বক্তব্য লিখে পাঠান। সে লেখাই এবারের সম্পাদকীয় হিসাবে মুদ্রিত হলো।

সম্পাদকমণ্ডলী

"কি আজীব সব সমাধান করে গেলছো তুমি!

এই তুই এই জমিটুকু টুকরো করে নে!
ওহে তুমি চিনে নাও ঐ তোমার বিচরণভূমি!

দেখে মনে হয় সমস্যা আসলে তবে কিছুই ছিল না,
ছিল হয়তো রহস্য ও রোমাঞ্চ সিরিজ
যা এত বছর কারো চিন্তায়ই এলো না
আমার, তোমার বা অন্য কোন ভূত ভারতীয়ের!
এ দেশেরও ভবিষ্যৎ আছে তবে?
এবার তো তাহলে তোমারই নিজের
দরজা জানলা ভাষা ও পোষাক মন্দির মসজিদ,
সাহেব-গ্রন্থটি—সব চিনে নিতে হবে!

আমরা যারা দেশ পড়ি সূর্যোদয়ে, নিউজপ্রিন্টে খাই খবরের খাবার
সেই সত্য মিথ্যা জ্যান্ত-জাহান্নাম তবে কার!

কি আজীব সব সমাধান করে ফেলছো তুমি বারংবার!"

বিভাব

RN 30017/76

Declaration U/S 5 of the press & Registration of Book Act.

১। প্রকাশের স্থান : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলি-১৭

২। প্রকাশের কালানুক্রম : ত্রৈমাসিক

৩। সম্পাদকের নাম : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
জাতীয়তা : ভারতীয়। ঠিকানা : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলি-১৭

৪। মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
জাতীয়তা : ভারতীয়। ঠিকানা : সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলি-১৭

৫। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা :
আরতি সেনগুপ্ত। ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলি-১৭

আমি, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(স্বাঃ) সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

Price : Rs. 5.00
Vol. 9 No. 2

BIVAV
May 1986

Reg. No.
R. N. No. 30017/76

PRODUCE ** PRESERVE ** PROSPER

Through a net work of warehouses all over West Bengal The State Warehousing Corporation offers services for storage and preservation of cereals, pulses, jaggery, cotton, jute, potatoes and other notified commodities like textile's paper, cement, steel, coal, machinery and other merchandise of any size or weight against losses from pests, rodents, birds and vegeries of weather.

Warehouse Receipt issued by the State Warehousing Corporation is a negotiable instrument for raising loan from nationalised and State Bank.

The Corporation also runs a Cold Storage at Tarakeswar, Dist-Hoogly.

For Scientific Storage

Please Contact your nearest State Warehousing Centre

Or

WEST BENGAL STATE WAREHOUSING CORPORATION

(A Government Undertakings)

6A, Raja Subodh Mullick Square (4th Floor)

Calcutta-700013

Phone No. :

26-6033
26-6060
26-6061
26-6062